Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ব্যক্তি জীবনে সুন্নতের গুরুত্ব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নুরে ইসনাত ফারজানা

রোলঃ 216020315228

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ব্যক্তি জীবনে সুন্নতের গুরুত্ব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নুরে ইসনাত ফারজানা

রোলঃ 216020315228

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ব্যক্তি জীবনে সুন্নতের গুরুত্ব " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নুরে ইসনাত ফারজানা, আইডিঃ 216020315228 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ ব্যক্তি জীবনে সুন্নতের গুরুত্ব ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: মুজিবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Nure Isnat Farzana

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

নুরে ইসনাত ফারজানা

আইডিঃ 216020315228

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা : 5

কুরআন হাদিসের আলোকে সুন্নাহ :...5

সুন্নত পালনের গুরুত্ব :..9

সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ..10

সুন্নতে যায়িদাহ..10

নবীজির দৃষ্টিতে যিকিরের :...12

সুন্নত যা হৃদ্রতা বাড়ায় :...13

পানাহার এর সুন্নাহ সমূহ ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা :...16

সুন্নতকে জীবিত করা ও বিদআতকে ঘৃণা করা...23

নবীজির জীবনের সুন্নত এর বাস্তব রূপ:...24

ব্যক্তি জীবনে সুন্নতের ভূমিকা:...35

পারিবারিক জীবনের সুন্নাতের ভূমিকা :...36

সামাজিক জীবনে সুন্নতের ভূমিকা :...37

নৈতিকতা ও চরিত্র গঠনের সুন্নত :...38

আধুনিক জীবনে সুন্নত চর্চার চ্যালেঞ্জ :..39

সুন্নত বাস্তবায়নে করণীয় দিক নির্দেশনা :...40

উপসংহার :...46

ভূমিকা :

মুমিনকে আল্লাহ তাআলা একটি ব্যবস্থাই দিয়েছেন, যাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে আল্লাহর নিকট কোনো কিছু আশা করার পূর্বশর্ত। আর তা হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদত্ত ব্যবস্থা ও তাঁর পবিত্র জীবনাদর্শ।
নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের ওপর বিশেষ ফজিলত রয়েছে। সুন্নত পালনের মাধ্যমে একজন মানুষ আল্লাহ তায়ালার আরও বেশি কাছে যেতে পারে। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও সুন্নত আঁকড়ে ধরার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন।ইসলাম কোন মানব রচিত জীবন ব্যবস্থা নয় বরং এটি একটি ওহী ভিত্তিক ও আল্লাহ প্রদত্ত ও তাঁর মনোনীত জীবন ব্যবস্থা। ইসলামী শরীয়তের মূলনীতি হল কুরআন ও সুন্নাহ। পবিত্র কুরআন যেমন ওহী প্রদত্ত, সুন্নাহও তেমনি ওহী। শরীয়তের এ দুটি মূলনীতি একটির সাথে অপরটি ওঁৎপ্রোতভাবে ভাবে জড়িত এ দুটির কোন একটিকে বাদ দিয়ে শরীয়তের কথা চিন্তা করার কোন অবকাশ নাই। সুন্নত পালনের মাধ্যমে আমরা আমাদের জীবনকে সুন্দর ও সাবলীল ভাবে সাজিয়ে নিতে পারে। নবীজির সুন্নত আঁকড়ে এবং তাকে অনুসরণের মধ্যেই মানুষের সফলতা রয়েছে। এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর। যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হতে পারে। (আলে ইমরান ১৩২)

কুরআন হাদিসের আলোকে সুন্নাহ :

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

يَاأَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، يَهْدِي بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ-

‘হে আহলে কিতাবগণ! তোমাদের নিকট আমাদের রাসূল এসেছে। যেসব বিষয় তোমরা তোমাদের কিতাব থেকে গোপন কর, সেসব বিষয় সে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিচ্ছে এবং বহু বিষয় সে এড়িয়ে যায়। বস্ত্ততঃ তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ হ’তে এসেছে একটি জ্যোতি ও স্পষ্ট বর্ণনাকারী কিতাব। তা দ্বারা (অর্থাৎ কুরআন দ্বারা) আল্লাহ ঐসব লোকদের শান্তির পথ সমূহ প্রদর্শন করেন, যারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে এবং তিনি তাদেরকে স্বীয় অভিপ্রায়ে (কুফরীর) অন্ধকার হ’তে (ঈমানের) আলোর দিকে বের করে আনেন। আর তিনি তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন’ *(মায়েদাহ ৫/১৫-১৬)*।

আল্লাহ তা‘আলা এখানে তাঁর নিজের মহিমাময় সত্তার পক্ষ থেকে এই সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে হেদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে যমীনের সকল আরব-অনারব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবার জন্যই প্রেরণ করেছেন। তিনি তাকে সুস্পষ্ট দলীল, হক ও বাতিলের পার্থক্য সহকারে পাঠিয়েছেন। এর যা কিছু তারা পরিবর্তন, বিকৃতি, অপব্যাখ্যা করেছে এবং সে বিষয়ে আল্লাহর উপর যা মিথ্যারোপ করেছে তিনি সবই সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। তারা পরিবর্তন করেছে এমন অনেক বিষয়ে তিনি চুপ থেকেছেন যা বর্ণনা করাতে কোন উপকার নেই।

এরপর আল্লাহ তা‘আলা কুরআন কারীম সম্পর্কে বলেন, যা তাঁর মহান নবীর উপর নাযিল করেছেন, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর সন্তুষ্টি কামনাকারীদেরকে হেদায়াত ও সুপথ সমূহ দেখিয়ে থাকেন। তথা নাজাত, নিরাপদ ও ইসতেকামাতের পথে পরিচালিত করেন। তাঁরই ইশারায় তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর পথ দেখান। তাদেরকে সিরাতে মুস্তাক্বীমের পথে পরিচালিত করেন। অর্থাৎ তাদেরকে ধ্বংসাত্মক সকল কিছু থেকে নাজাত দেন এবং তাদের জন্য সুন্দর পথ সমূহ দেখিয়ে দেন। ফলে সকল রকমের অনিষ্টকে তাদের থেকে সরিয়ে রাখেন, তাদের জন্য ভাল কাজ সমূহ করার পথ সুগম করেন, সকল প্রকার ভ্রষ্টতাকে তাদের থেকে দূরে রাখেন এবং তাদেরকে সঠিক অবস্থার দিকে দিকনির্দেশনা দান করেন।

আল্লাহ বলেন,قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ-

‘তুমি বল, হে মানবজাতি! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। যার জন্যই আসমান ও যমীনের রাজত্ব। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি জীবিত করেন ও মৃত্যু দান করেন। অতএব তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর, যিনি নিরক্ষর নবী। যিনি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন আল্লাহ ও তাঁর বিধান সমূহের উপর। তোমরা তার অনুসরণ কর যাতে তোমরা সুপথপ্রাপ্ত হ’তে পার’(*৭/১৫৮)*।

তিনি আরোও বলেন,قُلْ أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيْعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيْنُ

- ‘বল, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর ও রাসূলের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহ’লে রাসূলের দায়িত্বের জন্য তিনি দায়ী হবেন এবং তোমাদের দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী হবে। আর যদি তোমরা তার আনুগত্য কর,

তাহ'লে তোমরা সুপথ প্রাপ্ত হবে। বস্ততঃ রাসূলের উপর দায়িত্ব হ'ল কেবল সুস্পষ্টভাবে (আল্লাহর বাণী সমূহ) পৌঁছে দেওয়া' *(২৪/৫৪)*।

তিনি আরোও বলেন, وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 'আর নিশ্চয়ই তুমি পথ প্রদর্শন করে থাক সরল পথের দিকে' *(৪২/৫২)*। তিনি আরোও বলেন

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ,

'আর এটিই আমার সরল পথ। অতএব তোমরা এ পথেরই অনুসরণ কর। অন্যান্য পথের অনুসরণ করো না। তাহ'লে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুৎ করে দেবে। এসব বিষয় তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যাতে তোমরা (ভ্রান্ত পথ সমূহ থেকে) বেঁচে থাকতে পার' *(৬/১৫৩)*।

* আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوما خَطًّا، ثُمَّ قَالَ :هَذَا سَبِيلُ اللهِ، ثُمَّ خَطَّ ،خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ :هَذِهِ سُبُل- عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ ثُمَّ تَلَا- وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا) ...الأنعام :153(

'রাসূল (ছাঃ) আমাদের জন্য একদা একটি রেখা টানলেন। অতঃপর বললেন, এটি আল্লাহর পথ। এরপর সেই রেখার ডানে ও বামে আরও কিছু রেখা টানলেন। অতঃপর বললেন, এগুলিও পথ। এর প্রত্যেকটি পথে একজন করে শয়তান বসে আছে যে সেদিকে আহবান করছে। অতঃপর তিন তিলাওয়াত করেন- 'আর এটিই আমার সরল পথ' *(আন'আম ৬/১৫৩)*।[2]

* ইরবায বিন সারিয়া (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ ذَاتَ يَوْمٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا، فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ قَائِلٌ :يَا رَسُولَ اللهِ، كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ، فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ فَقَالَ :أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ-

‘একদা রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে ফজরের সালাত পড়ালেন। অতঃপর আমাদের দিকে মুখ ফিরালেন। এরপর আমাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দিলেন যাতে চোখগুলি অশ্রুসিক্ত হ’ল এবং অন্তরসমূহ বিগলিত হ’ল। জনৈক একজন বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) মনে হচ্ছে এটাই শেষ উপদেশ। সুতরাং আপনি আমাদেরকে কি আদেশ করবেন? তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহভীতি, (আমীরের) আদেশ শোনা ও আনুগত্য করার উপদেশ দিচ্ছি, যদিও তিনি হাবাশী কৃতদাসও হয়। কেননা তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরে বেঁচে থাকবে তারা অচিরেই চরম ইখতেলাফ দেখতে পাবে। এমতাবস্থায় তোমরা আমার ও আমার সুপথপ্রাপ্ত খলীফাগণের সুন্নাতের অনুসরণ করবে, তোমরা তা অবশ্যই আঁকড়ে ধরবে, তা তোমরা মাঢ়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরবে। (শরী‘অতে) সকল নতুন সৃষ্ট বিষয় থেকে সাবধান থাকবে। কেননা সকল নতুন সৃষ্টিই বিদ‘আত। আর সকল বিদ‘আতই ভ্রষ্টতা’।...

মুসনাদে আহমাদ ও আবূ দাউদে এসেছে

,

أَتَيْنَا الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ، وَهُوَ مِمَّنْ نَزَلَ فِيهِ }وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ :{فَسَلَّمْنَا، وَقُلْنَا :أَتَيْنَاكَ زَائِرِينَ وَعَائِدِينَ وَمُقْتَبِسِينَ، فَقَالَ الْعِرْبَاضُ:...

‘আমরা ইরবায বিন সারিয়ার নিকট আসলাম। তিনি হ’লেন তাদের অন্তর্ভুক্ত যাদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে :

وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ،

‘আর ঐসব লোকদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই যারা তোমার নিকট এজন্য আসে যে, তুমি তাদের (জিহাদে যাবার) জন্য বাহনের ব্যবস্থা করবে। অথচ তুমি বলেছ যে, আমার নিকটে এমন কোন বাহন নেই যার উপর তোমাদের সওয়ার করাবো’ *(তওবা ৯/৯২)*। তাকে আমরা সালাম দিলাম এবং বললাম, আমরা আপনার সাথে সাক্ষাত করতে, আপনার অসুস্থতার খবর নিতে এবং কিছু অর্জন করতে এসেছি। তখন ঈরবায বললেন,...।

ইবনে আববাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেন,

أَيُّهَا النَّاسُ اسْمَعُوْا قَوْلِيْ فَإِنِّيْ لَا أَدْرِيْ لَعَلِّيْ لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ يَوْمِيْ هَذَا فِي هذَا الْمَوْقِفِ، أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا وَإِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ وَقَدْ بَلَّغْتُ، فَذَكَرَ كَلَامًا كَثِيْرًا وَقَالَ فِي آخِرِهِ :فَاعْقِلُوْا أَيُّهَا النَّاسُ قَوْلِي فَإِنِّي قَدْ بَلَّغْتُ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ مَا إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوْا أَبَدًا، كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ...

‘হে লোক সকল! তোমরা আমার কথা শোন! কেননা আমি জানি না, হয়তো আজকের দিনের পর এই জায়গাতে আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে আর কোন কথা বলব না। হে লোক সকল! নিশ্চয়ই তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদসমূহ তোমাদের জন্য সম্মানিত তোমাদের রবের সাথে সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত, যেমন সম্মানিত তোমাদের এ দিনটি, তোমাদের এ নগরীতে। তোমরা অচিরেই তোমাদের রবের সাক্ষাত পাবে, আর তিনি তোমাদের আমলসমূহ সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞেস করবেন। আমি তো (তাঁর পয়গাম) পৌছিয়ে দিয়েছি। এভাবে তিনি অনেক কথা বলেছেন। শেষে বলেন, হে লোকসকল! আমার কথা ভালোভাবে বুঝ। কেননা আমি (তাঁর পয়গাম) পৌঁছিয়ে দিয়েছি। আর হে লোকসকল! তোমাদের মাঝে যা রেখে যাচ্ছি, তা যদি মযবূত করে আঁকড়ে ধর তাহ’লে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না; তা হ’ল, আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাত’।

সুন্নত পালনের গুরুত্ব :

‘সুন্নাহ’ এর শাব্দিক অর্থ হলো, পথ বা জীবনাদর্শ। ইসলামী পরিভাষায় সুন্নাহ অর্থ হলো, রাসূল (সা.) ও তাঁর সাহাবীগণ যে জীবনাদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন করেছেন সে জীবনাদর্শকে সুন্নাহ বলা হয়। এটা এমন এক আদর্শ, যা অনুসরণ করা ওয়াজিব। এ সুন্নাতের অনুসারীদের প্রশংসা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে এর বিরোধীদের নিন্দা করা হয়েছে। এজন্যই বলা হয় অমুক ব্যক্তি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অনুসারী। অর্থাৎ সে সুদৃঢ় ও প্রশংসিত আদর্শের অনুসারী। হাফেয ইবনে রজব (রহ.) বলেন, সুন্নাত হলো প্রচলিত পদ্ধতি, যা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের বিশ্বাস, আমল ও বক্তব্যসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে। এটাই হলো প্রকৃত সুন্নাত। (জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম : ১/১২০)

সুন্নত দুই প্রকারঃ

- সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ
- সুন্নতে যায়দাহ

সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ

যে সকল কাজ মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) নিজে সর্বদাই পালন করতেন অন্যদেরকে তা পালনের তাগিদ দিতেন তাকে সুন্নত মুয়াক্কাদাহ বলে। যেমন আযান ও ইকামত দেওয়া ফরজের ফরজ নামাযের পূর্বে দুই রাকআত যোহরের ফরজের পূর্বে চার রাকআত ও পরে দুই রাকআত মাগরিব ও এশার ফরজের পর দুই রাকআত নামায আদায় করা সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ ওয়াজিবের কাছাকাছি। এগুলো পালন করা কর্তব্য। ইচ্ছাকৃতভাবে বা অবহেলাবশত বিনা কারণে এগুলো পালন না করলে গুনাহ হয়।

সুন্নতে যায়িদাহ

সুন্নতে যায়িদাহ হল অতিরিক্ত সুন্নত। পরিভাষায় যে সকল কাজ নবি (স.) করেছেন বলে প্রমাণিত তবে তিনি সর্বদা তা পালন করতেন না বরং কখনো করতেন আবার কখোনো ছেড়ে দিতেন এসব কাজকে সুন্নত যায়িদাহ বলা হয়। মহানবি (স.) এরূপ কাজ করার জন্য উম্মতকে উৎসাহিত করছেন। তবে এ ব্যাপার তিনি তাগিদ করেননি এবং তা না করলে গুনাহ হয় না।

সুন্নতে যায়িদাহকে সুন্নতে গায়রে মুয়াক্কাদাহও বলা হয়। যেমন আসর ও এশার ফরজের পূর্বে রাকআত সুন্নত নামায আদায় করা। সুন্নতে যায়িদাহ পালনে অনেক সাওয়াব অর্জন করা যায়।

قُل إِن كُنتُم تُحِبّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعوني يُحبِبكُمُ اللَّهُ وَيَغفِر لَكُم ذُنوبَكُم وَاللَّهُ غَفورٌ رَحيمٌ

বল, 'যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'।[৩:৩১]

لَقَد كانَ لَكُم في رَسولِ اللَّهِ أُسوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كانَ يَرجُو اللَّهَ وَاليَومَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثيرًا

অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।[৩৩:২১]
আল্লাহ কুরআন মাজীদ নাযিল করেছেন মানবজাতির হেদায়েতের জন্য, আমাদের জীবন সাবলীল ভাবে পরিচালনার যাবতীয় দিকনির্দশনা দান করেছেন, তেমনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করে কুরআন মাজীদের বাস্তব নমুনা তিনি মানবজাতির সামনে তুলে ধরেছেন।সুতরাং ঈমানের অন্যতম দাবী হচ্ছে দৈনন্দিন জীবনে রাসুলের অনুকরণ ও অনুসরণ করা।
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,
যে ব্যক্তি আমার সুন্নতকে জীবিত করল, সে আমাকেই ভালোবাসল, আর যে ব্যক্তি আমাকে ভালোবাসল সে আমার সঙ্গেই জান্নাতে থাকবে। [সুনানে তিরমিযি, হাদীস নং-২৬৭৮]
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,
আমার প্রত্যেক উম্মতই জান্নাতে প্রবেশ করবে, কিন্তু যে অস্বীকার করবে সে ব্যতীত।

সাহাবায়ে কেরামগন বললেন,
কে অস্বীকার করবে.?? রাসূল ﷺ বললেন, যারা আমার সুন্নত অনুসরণ করবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যারা আমার অবাধ্য হবে তারাই অস্বীকারকারী হিসেবে গন্য হবে। [বুখারী- ৭২৮০]

রাসূল ﷺ বলেন,
যে ব্যক্তি আমার সুন্নত অপছন্দ করল তার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই [বুখারী ৪৭৭৬]
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,
যে ব্যক্তি আমার এমন কোনো সুন্নত জীবিত করবে, যা আমার [মৃত্যুর পর] পর বিলীন হয়ে যাবে, তার জন্য রয়েছে সেই সুন্নতের উপর আমলকারীর সম-পরিমাণ সাওয়াব। এ ক্ষেত্রে যারা সুন্নতের উপর আমল করবে তাদের সাওয়াব থেকে বিন্দু পরিমান সাওয়াব কম করা হবে না। [সুনানে তিরমিযি, হাদীস নং- ২৬৭৭]

নবীজির দৃষ্টিতে যিকিরের :

باب فَضْلِ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لاَ يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ

মুহাম্মাদ ইবনু আলা (রহঃ) ... আবূ মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যাক্তি তার রবের যিকর করে, আর যে ব্যাক্তি যিকর করে না, তাদের দু'জনের দৃষ্টান্ত হলো জীবিত ও মৃতের। [বুখারী ৬৪০৭]

মুমিনের জীবনে আল্লাহর জিকির বা স্মরণের গুরুত্ব অপরিসীম। পবিত্র কোরআনে আল্লাহর জিকিরকে নামাজ তথা ইবাদতের উদ্দেশ্য বলা হয়েছে। পবিত্র কোরআনের একাধিক আয়াতে জিকিরের তাগিদ দেওয়া হয়েছে। অসংখ্য হাদিসে বর্ণিত হয়েছে জিকিরের মর্যাদা।

যেমন মহান আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনরা! তোমরা আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো।' (সুরা : আহজাব, আয়াত : ৪১-৪২)

আবদুল্লাহ ইবনু বুসর (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসুল! আমার জন্য শরিয়তের বিষয়াদি অতিরিক্ত হয়ে গেছে। সুতরাং আমাকে এমন একটি বিষয় জানান, যা আমি শক্তভাবে আঁকড়ে থাকতে পারি। তিনি বললেন, সর্বদা তোমার জিহ্বা যেন আল্লাহর জিকির দ্বারা সিক্ত থাকে। (সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ৩৩৭৫)

হাদিসবিশারদরা বলেন, সাহাবির সমগ্র শরিয়তের ব্যাপারে অনুযোগের উত্তরে নবী করিম (সা.) একটি আমল বলে দিয়েছেন। তিনি বলেন, শরিয়তের সব বিধানই আবশ্যক। যার দ্বারা প্রমাণ হয়, আল্লাহর জিকির এমন আমল তা মানুষকে শরিয়তের ওপর পরিপূর্ণরূপে আমল করতে সাহায্য করে।

وَعَنْ أَبِىْ الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ؟ وَأَرْفَعِهَا فِىْ دَرَجَاتِكُمْ؟ وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ وَخَيْرٍ لَّكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوْا أَعْنَاقَكُمْ؟» قَالُوا: بَلٰى قَالَ: «ذِكْرُ اللهِ». رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَهْ إِلَّا أَنَّ مَالِكًا وَقَفَه عَلٰى أَبِى الدَّرْدَاءِ

তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আমি কি তোমাদেরকে বলে দিব না, তোমাদের কাজ-কর্মের মধ্যে কোন্ কাজটি তোমাদের মালিকের কাছে অধিক পবিত্র এবং তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধির ব্যাপারে অধিক কার্যকর। তাছাড়া তোমাদের জন্য সোনা-রূপা দান করার চেয়েও শ্রেষ্ঠ এবং এ কথার চেয়েও শ্রেষ্ঠ যে, তোমরা শত্রুর মুকাবিলা করবে, তাদের গলা কাটবে, আর তারা তোমাদের গলা কাটবে (যুদ্ধ করবে)। তাঁরা উত্তরে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি বলুন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তা হলো আল্লাহর জিকির বা স্মরণ করা। (মালিক, আহমদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ। কিন্তু ইমাম মালিক এ হাদীসটিকে মাওকূফ হাদীস অর্থাৎ- আবূ দারদা (রাঃ)-এর কথা বলে মনে করেন।

হাদিস নম্বর ৩৩৭৫

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ، رضى الله عنه أَنَّ رَجُلاً، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ شَرَائِعَ الإِسْلاَمِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَىَّ فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ . قَالَ " لاَ يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

আবদুল্লাহ্ ইবনু বুস্‌র (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

এ লোক বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার জন্য ইসলামের শারী'আতের বিষয়াদি অতিরিক্ত হয়ে গেছে। সুতরাং আমাকে এমন একটি বিষয় জানান, যা আমি শক্তভাবে আঁকড়ে থাকতে পারি। তিনি বললেনঃ সর্বদা তোমার জিহ্বা যেন আল্লাহ তা'আলার যিকিরের দ্বারা সিক্ত থাকে।সহীহঃ ইবনু মাজাহ (হাঃ ৩৭৯৩)

সুন্নত যা হৃদ্রতা বাড়ায় :

সুন্নত পালনের মাধ্যমে সকল ব্যক্তির প্রতি ভাতৃত্ববোধ ও হৃদ্রতার সম্পর্কে জাগ্রত হয়।

সালামের সুন্নাহ:

তুমি পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে সালাম দেবে। (সহীহুল বুখারী)

সুস্পষ্ট ও শুদ্ধ উচ্চারণে আসসালামু আলাইকুম বলা।

ইসলামে সালামের গুরুত্ব ও ফজিলত অনেক। শান্তির ধর্ম ইসলাম আর ইসলামে আছে সব ধরনের দিকনির্দেশনা।ইসলামের শান্তির প্রতীকগুলোর মধ্যে আছে সালাম 'আসসালামু আলাইকুম ওয়ারহমাতুল্লাাহি ওয়াবারাকাতুহ'র অর্থ হচ্ছে আপনার ওপর আল্লাহর শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। সালাম দেওয়া-নেওয়া কোনো ব্যক্তি

বিশেষের সঙ্গে সীমাবদ্ধ নয়। একজন মুসলমানের সঙ্গে যখন অন্য মুসলমানের দেখা হয়; তখন প্রথমে সালাম দেওয়া উচিত। সালাম আরবি শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে শান্তি, প্রশান্তি, কল্যাণ, দোয়া, শুভ কামনা। সালাম একটি সম্মানজনক, অভ্যর্থনামূলক, অভিনন্দনজ্ঞাপক, উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন পরিপূর্ণ ইসলামি অভিবাদন। 'সালাম' আল্লাহর সুন্দর নামসমূহের মধ্যে অন্যতম। (সুরা হাশর, আয়াত: ২৪)

আল্লাহ তাআলা প্রথমে আদি মানব হজরত আদমকে (আ.) সালাম শিক্ষা দেন। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা হজরত আদমকে (আ.) সৃষ্টি করে বলেন, যাও ফেরেশতাদের সালাম দাও। তারা তোমার সালামের কী উত্তর দেন, মন দিয়ে শোনো। এটিই হবে তোমার এবং তোমার সন্তানদের সালাম। সে অনুযায়ী হজরত আদম (আ.) ফেরেশতাদের বলেন, আসসালামু আলাইকুম। অর্থ- আপনাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। ফেরেশতারা উত্তরে বলেন, আসলামু আলাইকা ওয়া রহমাতুল্লাহ। অর্থ- আপনার ওপর শান্তি এবং আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। অন্যের ঘরে সালাম না দিয়ে প্রবেশ করা নিষেধ। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য ঘরে প্রবেশ করো না, যে পর্যন্ত আলাপ-পরিচয় না করো এবং তাদের সালাম না করো। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যাতে তোমরা স্মরণ রাখো। (সুরা নূর, আয়াত: ২৭)

জাবির ইবনু সুলাইম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললাম, 'আলায়কাস সালাম'। তিনি বললেন, 'আলায়কাস সালাম' বলো না, বরং 'আসসালামু আলায়কা' বলো।

আবু উমামা আল-বাহিলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকটে উত্তম সেই ব্যক্তি যে প্রথমে সালাম দেয়।

কোনো জনসমাগম বা জনপদে এলে তিনবার সালাম দেওয়া

আনাস ইবনু মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোনো কথা বলতেন, তখন তা (ভালোভাবে) বুঝানোর জন্য তিনবার বলতেন। আর যখন তিনি কোনো গোত্রের কাছে যেতেন তখন তাদেরকে তিনবার সালাম দিতেন।

সালাম দেওয়ার মাধ্যমে দুজন ব্যক্তির মধ্যে বার্তা বিনিময়ের সূচনা হয়। একে অপরের সাথে হৃদ্রতার সম্পর্ক তৈরি হয়।

মুসাফাহা:

কোনো পুরুষের সাথে সাক্ষাৎ হলে নবীজি তার সাথে মুসাফাহা করতেন। মুসাফাহা মানে দুজনে হাত মেলানো। করমর্দন করা। আনাস রা. বলেছেন,

كَانَ إِذَا لَقِيَهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَامَ مَعَهُ قَامَ مَعَهُ فَلَمْ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِي يَنْصَرِفُ عَنْهُ، وَإِذَا لَقِيَهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَتَنَاوَلَ يَدَهُ نَاوَلَهُ إِيَّاهَا فَلَمْ يَنْزِعْ يَدَهُ مِنْهُ حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِي يَنْزِعُ يَدَهُ مِنْهُ، وَإِذَا لَقِيَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ فَتَنَاوَلَ أُذُنَهُ نَاوَلَهُ إِيَّاهَا ثُمَّ لَمْ يَنْزِعْهَا حَتَّى يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِي يَنْزِعُهَا عَنْهُ.

'নবীজির সাথে কোনো সাহাবীর দেখা হলে তিনি সাহাবীর সাথে দাঁড়িয়ে থাকতেন, সাহাবী নিজ থেকে সরে না যাওয়া পর্যন্ত নবীজি সরে আসতেন না। কোনো সাহাবী তার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসে তার হাত ধরলে (মুসাফাহা করলে), অপর পক্ষ হাত টেনে না নেওয়া পর্যন্ত তিনি নিজের হাত টেনে নিতেন না। কেউ দেখা করতে এসে তাঁর কানে কানে চুপি চুপি কথা বলতে চাইলে, নবীজি অপর পক্ষের আগে নিজেকে সরিয়ে আনতেন না।''

অপূর্ব আখলাকের অধিকারী ছিলেন আমাদের নবীজি। কারো সাথে দেখ হলে চমৎকার ভঙ্গিতে সাদরে গ্রহণ ও বরণ করে নিতেন। কোমল আর মোলায়েম হতো তার অভিব্যক্তি। আল্লাহ তাআলা তাঁর আচরণকে স্বীকৃতি দিলে বলেছেন,

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ

'নিশ্চয়ই আপনি মহত্তম চরিত্রের অধিকারী।"(৬৮:৪)

মুসাফার মাধ্যমে ভাতৃত্ববোধ জাগ্রত হয়, এসব আচরণ আসলে সৌজন্যবোধ আর ভদ্রতা থেকে উৎসারিত হয় সম্মান করতে জানলে এমন শুচিতা প্রকাশ করা যায়।নবীজির একেকটি সুন্নতে বহুমুখী উপকারিতা থাকে। নবীজির সুন্নতে জড়িয়ে থাকে বহুমুখী সৌন্দর্য। নবীজির সুন্নতে আছে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও মানুষের প্রতি সম্মানবোধ। উল্লেখ্য, নবীজি কখনো বেগানা নারীর সাথে মুসাফাহা করেননি। আমি নারীর সাথে মুসাফাহা করছি না, এটা হারাম। পাশাপাশি এমনটা না করা সুন্নত। নিয়তের মাধ্যমে হারাম থেকে বাঁচার ইবাদতের পাশাপাশি সুন্নত পালনের সওয়াবও পাব ইনশাআল্লাহ। রব্বে কারীম আমলের তাওফিক দান করুন। আমিন।

মুচকি হাসি :

নবিজী (সা.) বলেছেন:

তোমার ভাইয়ের জন্যে তোমার মুচকি হাসিও সাদাকাস্বরূপ।

আবদুল্লাহ বিন হারেস (রা.) বলেছেন:
আমি রাসুলুল্লাহর চেয়ে বেশি মুচকি হাসতে আর কাউকে দেখিনি।
একটু হাসিতেই সমাজের কত কত সমস্যা সমাধান হয়ে যায়। হাসি যে শুধু আনন্দের সময় দিতে হবে এমন নয়, দুঃখ-শোক-তাপের সময়ও নবিজী (সা.) মুচকি হাসি দিয়েছেন।আমাদের কারো সাথে কখনো মনোমালিন্য হলে মুচকি হাসি দিয়ে কথা বললে অভিমান দুঃখ বিলীন হয়ে যাবে। মুচকি হাসার মাধ্যমে একে অন্যের মধ্যে মধুর সম্পর্ক সৃষ্টি হবে সাথে সাওয়াব ও হবে।
শি'আর একটি (স্লোগান) হলো:
ইন তুতীউহু তাহতাদু)وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا(: যদি তার (নবিজীর) অনুসরণ করো, হিদায়াত পেয়ে যাবে (নূর:৫৪)

পানাহার এর সুন্নাহ সমূহ ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা :

১। খাওয়ার পূর্বে- 'উভয় হাত উত্তম রূপে ধুয়ে নেয়া এবং কুলি করা'

সালমান আল-ফারসী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাওরাতে পড়েছিলাম, খাবারের বারাকাহ খাওয়ার পর ওযু করার মধ্যে নিহিত। আমি বিষয়টি আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললাম এবং তাওরাতে আর যা যা পড়েছি সেগুলোও বললাম। তখন আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, খাওয়ার আগে ও পরে ওযু করার মধ্যে খাবারের বারকাহ রয়েছে। ওযুর মাধ্যমে আমরা দুই হাত কব্জি পর্যন্ত উত্তম রূপে ধৌত করি , ফলে মাধ্যমে সবজি মানুষ সংক্রমণ না থেকে আমরা হেফাজত থাকি রোগ জীবাণু সংক্রমণ থেকে হেফাজত থাকতে পারি।হাত পরিষ্কার করার মাধ্যমে ময়লা, জীবাণু এবং সম্ভাব্য সংক্রামক এজেন্ট অপসারণ করে, যার ফলে রোগ সংক্রমণের ঝুঁকি হ্রাস পায়।

বাম হাত দ্বারা না খাওয়া:

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা বাম হাত দ্বারা খাবার খেয়ো না ও পান করো না। কেননা শয়তান বাম হাতে খায় ও পান করে।বাম হাতে খাবার গ্রহণকারীকে তিরস্কার করেছেন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এবং বাম হাতের ব্যবহারকে অহংকারের চিহ্ন হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। হাদিসে এসেছে,

عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلاً أكل عند النبي صلى الله عليه
وسلم بشماله، فقال :كل بيمينك« » ، قال :لا أستطيع، قال :»لا استطعت«، ما منعه إلا
.الكبر، قال :فما رفعها إلى فيه
বাম হাতের মাধ্যমে খাবার খাওয়া অপ্রশংসনীয় ও শিষ্টাচার বহির্ভূত কাজ।

আঙুল চেটে খাওয়া :

জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন খাবার শেষে হাত চেটে না খেয়ে, তা মুছে না ফেলে। কেন না সে জানে না খাবারের কোন অংশে বারাকাহ আছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাওয়ার মাঝে এবং পরে আঙুল চেটে খেতেন। (তিরমিজি শরীফ)। এ বিষয়ে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে আবিষ্কার করেছেন খাওয়া শেষ হলে আঙুল চাটার সময় মুখের ভেতর সেলিভারী গ্ল্যান্ড (Salivary Gland) থেকে টায়ালিন (Ptyalin) নামক এক প্রকার পাচক রস বের হয়, যা খাবার পাকস্থলী থেকে শিষণ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার আগেই প্রায় অর্ধেক হজম হয়ে যায়।

টয়লেট পেপার বা ঢিলা /কুলুপ ব্যবহার :

সালমান আল-ফারসী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল আমাদেরকে ডান হাতে পরিচ্ছন্ন হতে কিংবা (ইস্তিঞ্জার সময়) কিবলাভিমুখী হতে নিষেধ করেছেন। তিনি গোবর ও হাড্ডি দ্বারা পরিচ্ছন্ন হতে নিষেধ করেছেন আর বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যেন তিনটি ঢিলার কম দিয়ে ইস্তিঞ্জা না করে'।

মন্তব্য: উক্ত হাদীস দ্বারা জানা যায় –

টিস্যু/কুলুক বাম হাতে ব্যবহার করা

টিস্যুর পরিবর্তে হাড্ডি বা নাপাক কোনো কিছু ব্যবহার না করা

ন্যূনতম তিনটি টিস্যু ব্যবহার করা।

পানি খরচ করার আগে ঢিলা-কুলুপ বা টয়লেট পেপার ব্যবহার করা। (বায়হাকি, হাদিস-৫১৭)

ঢিলা ও পানি খরচ করার সময় বাম হাত ব্যবহার করা। (বুখারি শরিফ, হাদিস-১৫৪)। প্রস্রাব পায়খানার পর ঢিলা কুলুপ ব্যবহার করা সুন্নত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব সময় আগে ঢিলা ব্যবহার করতেন তারপর পানি। রাসুল (সা.) সাহাবায়ে কেরামকে ঢিলা-কুলুপ ব্যবহার করার জন্য জোর তাগিদ দিতেন।

বর্তমান আধুনিক বিজ্ঞান চৌদ্দশ বছর আগের সেই কথার বাস্তবতা স্বীকার করেছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলেন, শরীরের নানা প্রকার জীবাণুর ১০ শতাংশ মলত্যাগের সাথে বের হয়। তাই মলত্যাগ শেষ হলে গুহ্যদ্বারে প্রথমে ঢিলা ব্যবহার করা তারপর পানি। শুধু পানি ব্যবহার করলে মলত্যাগের জীবাণু হাতের আঁকাবাঁকা রেখাগুলোতে ঢুকে থাকে। ঢিলা ব্যবহারের পর, পানি ব্যবহার করলে মলদ্বার সুন্দরভাবে পরিষ্কার হয় এবং হাতেও কোনো জীবাণু লেগে থাকে না।

তারপর মাটিতে হাত ঘষে ধৌত করা। এরও অনেক যুক্তিসংগত কারণ আছে। বক্র কৃমির ডিম খুব ছোট হয়, যা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। হাতের চিকন রেখাগুলোতে এ ডিমগুলো বসে থাকে। হাত যতই কচলিয়ে ধোয়া হোক না কেন এগুলো দূর হয় না। কিন্তু মাটিতে ভালোভাবে হাত ঘষে ধুলে ওগুলো আর থাকতে পারে না।

বসে পান করা :

আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে দাঁড়িয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন।

বলা হয় স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। আর স্বাস্থ্য গঠনে পানি হ'ল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। পানি এমন একটি উপাদান যা ব্যতীত জীবন ধারণ অসম্ভব। মানুষের শরীরের ৬০-৭৫ ভাগ অংশ পানি দ্বারা গঠিত। আল্লাহ বলেন, أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ 'আমরা কি তোমাদেরকে সৃষ্টি করিনি নিকৃষ্ট পানি হ'তে?' *(মুরসালাত ৭৭/২০)*। তিনি আরো বলেন, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا- 'তিনিই মানুষকে পানি হ'তে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি তার বংশগত ও বিবাহগত সম্পর্ক নির্ধারণ করেছেন। বস্তুতঃ তোমার প্রতিপালক সর্বশক্তিমান' *(ফুরক্বান ২৫/৫৪)*।

আমরা সকলে জানি আমাদের বিশুদ্ধ পানি পান করতে হবে। প্রশ্ন হ'ল- কেবল বিশুদ্ধ পানি পান করলেই কি শরীর সুস্থ থাকবে? নাকি সুনির্দিষ্ট কোন নিয়ম-পদ্ধতি মেনে পানি পান করতে হবে? ইসলাম নির্ধারণ করে দিয়েছে পৃথিবীতে সকল বস্তু ব্যবহারের সুনির্দিষ্ট নিয়ম-পদ্ধতি। পানি পান করারও রয়েছে সুনির্দিষ্ট নিয়ম। আমরা যদি এই নিয়মের ব্যতিক্রম করি তবে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের কিভাবে পানি পান করতে হয় তা শিখিয়েছেন। এক্ষণে আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাতী পদ্ধতিতে পানি পান করলে কি উপকার লাভ হবে এবং না করলে কি ক্ষতির সম্মুখীন হ'তে হবে তা জানার চেষ্টা করব।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দাঁড়িয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا، 'নবী করীম (ছাঃ) দাঁড়িয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।অর্থাৎ দাঁড়িয়ে পানি পান করলে ক্ষতির সম্মুখীন হ'তে হবে। যেমন-

১. বদহজম : দাঁড়িয়ে পানি পান পরিপাকতন্ত্রকে ধ্বংস করতে পারে। কারণ আমরা যখন দাঁড়িয়ে পানি পান করি, তখন তা প্রচন্ড শক্তি ও গতির সঙ্গে খাদ্যনালীর মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে এবং সরাসরি নীচের পেটে গিয়ে পড়ে, যা ক্ষতিকর। ফলে এর কারণে বদহজম হ'তে পারে।

২. ট্রিগার আর্থ্রাইটিস : দাঁড়িয়ে পানি পান করাবস্থায় স্নায়ুগুলি উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থায় থাকে, যা শরীরে তরলের ভারসাম্যকে ব্যাহত করে। যার ফলে শরীরে টক্সিন এবং বদহজম বৃদ্ধি পায়। এটি জয়েন্টগুলোতে তরল জমা করে এবং আর্থ্রাইটিসকে ট্রিগার করে। ডাঃ রুস্তগি বলেছেন, 'দাঁড়িয়ে পানি পান করলে জয়েন্টে তরল জমা হ'তে পারে এবং বাতের সমস্যা এবং জয়েন্টের ক্ষতি হ'তে পারে'।

৩. ফুসফুসের ঝুঁকি বাড়ে : দাঁড়িয়ে পানি পান করলে প্রয়োজনীয় পুষ্টি ও ভিটামিন লিভার ও পরিপাকতন্ত্রে সঠিকভাবে পৌঁছায় না। আমরা যখন দাঁড়িয়ে পানি পান করি তখন পানি সিস্টেমের মধ্য দিয়ে খুব দ্রুত প্রবাহিত হয় এবং তা ফুসফুস এবং হার্টের কার্যকারিতাকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলে। কারণ এইভাবে পানি পান করলে অক্সিজেনের মাত্রা ব্যাহত হয়।

৪. কিডনির সমস্যা : গবেষণায় জানা গেছে যে, আমাদের কিডনী বসে থাকা অবস্থায় ভাল ফিল্টার করে। দাঁড়িয়ে পানি পান করার সময়, উচ্চ চাপে তরল কোন পরিস্রাবণ ছাড়াই পেটের নীচের দিকে চলে যায়। এর ফলে পানির দূষিত কণা মূত্রাশয়ে জমা হয় এবং কিডনির কার্যকারিতা ক্ষতিগ্রস্ত করে। অনেক সময় মূত্রনালীতে পাথর জমতে পারে।[2]

উপরোক্ত সমস্যাগুলো হ'তে বাঁচতে হ'লে দাঁড়িয়ে নয়, বরং বসে পানি পান করতে হবে।

তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করা :

তিন নিঃশ্বাসে অর্থাৎ ধীরে ধীরে পানি পান করতে হবে।

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,كَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ ثَلاَثًا وَقَالَ "هُوَ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ وَأَبْرَأُ 'নবী করীম (ছাঃ) তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করতেন এবং বলতেন, এভাবে পানি পান করলে তৃষ্ণা উত্তমরূপে নিবারিত হয়, খাদ্য অধিক হজম হয় এবং স্বাস্থ্য ভাল থাকে'।[3]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করতে বলেছেন। একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের শরীরে দৈনিক গড়ে ৩.৭ লিটার পানির প্রয়োজন হয়। যা মূলতঃ সে সারাদিনে যত পরিমাণ স্বাভাবিক পান করে, যত ধরনের শরবত পান করে এবং যে খাদ্য সে ভক্ষণ করে তা হ'তে আসে। আবার একজন মানুষ যখন পানি গিলে খায়, সাধারণত প্রায় ৫০-১০০ মি.লি. পানি প্রতি ঢোকে গিলে খাওয়ার সাথে সাথে খাদ্যনালী এবং পেটে প্রবেশ করে। তবে চুমুকের আকার এবং গিলে ফেলার ধরনের উপর ভিত্তি করে এর পরিমাণ কমবেশী হয়। আবার কোনকিছু গিলার সময় ০.৫-১.৫ মিলি মুখের লালা খাদ্যনালী দিয়ে পেটে প্রবেশ করে। এই লালা খাদ্য হজমে সহায়তা করে। লালায় অ্যামাইলেজ নামক এনজাইম রয়েছে, যা হজমের প্রাথমিক পর্যায়ে ভূমিকা পালন করে। অ্যামাইলেজ জটিল কার্বো-হাইড্রেটগুলিকে সহজ শর্করাতে ভেঙ্গে দেয়। যখন আমরা খাদ্য গ্রহণ করি, তখন লালা আমাদের মুখের খাবারের সাথে মিশে যায় এবং লালার মধ্যে থাকা অ্যামাইলেজ এনজাইম খাদ্যের মাল্টোজ এবং ডেক্সট্রিন নামক স্টার্চ ভেঙ্গে ফেলতে সহায়তা করে।

এই এনজাইমেটিক হজম খাদ্যের রাসায়নিক ভাঙ্গনের একটি অংশ যা পাকস্থলীতে পৌঁছানোর আগে মুখের মধ্যে ঘটে। একবার খাবার গিলে ফেলা হ'লে এটি পরিপাকতন্ত্রের মধ্য দিয়ে চলে যায় এবং অন্যান্য পাচক এনজাইম এবং পাকস্থলীর অ্যাসিডের সাহায্যে পাকস্থলী এবং ক্ষুদ্রান্ত্রে আরো হজম ক্রিয়া চালাতে থাকে।

তাই পানি একেবারে পান না করে ধীরে ধীরে পান করা উচিত। যখন তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করা হবে, তখন পানি ধীরে ধীরে পেটে পৌঁছবে এবং এতে অধিক পরিমাণ লালা পেটে যাওয়ার সুযোগ পাবে। ফলে আমাদের হজম ক্রিয়া বৃদ্ধি পাবে।

পানাহারের ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা:

মিকদাম ইবনু মা'দী কারিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মানুষ পেট হতে অধিক নিকৃষ্ট কোনো পাত্র পূর্ণ করেনি। মেরুদণ্ড সোজা রাখতে পারে এমন কয়েক লোকমা খাবারই আদম সন্তানের জন্য যথেষ্ট। এতটুকুর চেয়ে বেশি খাবার যদি খেতে হয়, তবে পাকস্থলীর এক-তৃতীয়াংশ খাদ্যের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানীয়ের জন্য এবং এক-তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য বরাদ্দ রাখবে।

কম খাবার গ্রহণ বেশি দিন বেঁচে থাকার উপায় বলে মনে করছেন অনেক গবেষক। এর সত্যতা কতটা? নিউ ইয়র্ক টাইমস অবলম্বনে লিখেছেন, সালাহ উদ্দিন শুভ্র কম খেলে দীর্ঘায়ু হওয়া যায় এমন এক বিশ্বাস প্রচলিত আছে। কম খেলে শরীর অধিক সুস্থ থাকে। এখানে কম খাওয়া বলতে ক্যালরি গ্রহণে নিয়ন্ত্রণ আরোপকে বোঝানো হচ্ছে। কম ক্যালরি গ্রহণ করলে শরীরকে তার বিপাক ক্রিয়ায় কম শক্তি ও সময় ব্যয় করতে হয়। এর ফলে শারীরিক জটিলতা কম হয়, হৃদযন্ত্রের উপকার ঘটে।

খাবার ও পানপাত্রে ফু না দেওয়া:

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো খাবারে কিংবা পানিতে ফু দিতে না তিনি পান করার সময় পাত্রে নিঃশ্বাস ফেলতেন না

প্রত্যেক বিষয়ে সুন্নতের অনুসরণে বরকত নিহিত। সুন্নতের অনুসরণ না করা হলে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। প্রিয়নবী (স.) আমাদের অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়েও দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। মুসলমানরা সেগুলো সুন্নত হিসেবেই পালন করেন। ফলস্বরূপ অজান্তেই বরকত লাভ করেন এবং নানা ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকেন।

পানি পান করা ও পানপাত্র ব্যবহারেও সুন্নত পদ্ধতি রয়েছে। পাত্রে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন নবীজি (স.)। ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (স.) পানপাত্রে নিঃশ্বাস ফেলতে ও তাতে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন। (ইবনে মাজাহ: ৩৪২৮)

এই হাদিসের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানও সহমত পোষণ করে। আমরা জানি, পানি পানের সময় পাত্রে নিঃশ্বাস ফেলার দরুন সেই পানি বিষাক্ত হয়ে যায়।

বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেছে, মানুষ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য নাক ও মুখ দিয়ে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে। নিঃশ্বাসে থাকে দেহের দূষিত বাষ্প ও রোগ-জীবাণুবাহী অপেক্ষাকৃত ভারী বায়বীয় পদার্থ কার্বন ডাই-

অক্সাইড, যা খাবার কিংবা পানির সঙ্গে মিশে আবার মানুষের দেহের ভেতরে প্রবেশ করে। ফলে শরীরে বিভিন্ন রোগ-জীবাণুর আস্তানা গড়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

দস্তরখানা বিছিয়ে খাওয়া :

আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাবারের রুচিবর্ধক কোনো খাবারের পাত্র সামনে নিয়ে খাবার খেয়েছেন কিংবা তাঁর জন্য মশৃণ পাতলা রুটি বানানো হয়েছে বলে আমার জানা নেই। আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করা হলো, আল্লাহর রসূল ও সাহাবিগণ কীসের ওপর খাবার গ্রহণ করতেন? তিনি বললেন, 'চামড়ার দস্তরখানের ওপর। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লমের দস্তরখানে কোনো আয়েশি খাবারের আয়োজন থাকত না।তিনি সমতলে বসে দস্তর খানে খেজুর ইত্যাদি রেখে খেতেন। এমন না যে সে সময় ডাইনিং টেবিলের প্রচলন ছিল না সে যুগেও রাজা-বাদশারা ডাইনিং টেবিলে খাবার খেতো। তিনি তা বর্জন করেছেন। দস্তরখানা এতোটুকু প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিত যাতে খাবার করলে তা তুলে খাওয়া যায়।

মেসওয়াক :

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আমি যদি আমার উম্মতের উপর কষ্টকর হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা না করতাম তাহলে তাদেরকে প্রত্যেক অজুর সঙ্গে মিসওয়াক করার আদেশ দিতাম। মেসওয়াক রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অভ্যাস এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি সুন্নত। তাঁর ইন্তেকাল হয়েছে মেসওয়াকরত অবস্থায়। তিনি বলেন, এমন কখনো হয়নি যে, জিবরাঈল আমার কাছে এসেছেন আর আমাকে মেসওয়াক করার আদেশ করেননি। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা এ সুন্নত থেকে বেশকিছু তথ্য বের করেছেন। দাঁতের ভয়ংকর কয়েকটি রোগ হয়ে থাকে। যেমন : জিঞ্জিভাইটিস (Gingivitis), এ রোগ হলে দাঁতের মাড়ি থেকে রক্ত পড়তে থাকে এবং পচন ধরে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়। কেরিস টিথ- এ রোগ হলে দাঁতের ক্ষয় শুরু হয়। পাইওরিয়া (Pyorrhoea)- এতে দাঁতের মাড়ি ফুলে যায়, রক্ত ঝরে। মিসওয়াক এ রোগগুলো দূর করতে সক্ষম। চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রমাণ করে দেখিয়েছে যে, মেসওয়াক ব্যবহারের দ্বারা মৃতের মস্তিষ্কের সুস্থতা অটুট থাকে। মেসওয়াক ব্যবহার না করলে মুখে ব্যাকটেরিয়া জন্মায় এবং তা থেকে মাড়ি ও চোয়ালে পুঁজ সৃষ্টি হয়, যা মস্তিষ্কের রোগ এবং হৃদরোগও হওয়ার কারণ।

কখনো কখনো গর্মি, দুর্গন্ধ এবং জীবাণুর কারণে মুখের ভেতর ফোঁড়া হয়ে ঘা সৃষ্টি হয়। এগুলো কখনো প্রকাশ পায় আবার কখনো প্রকাশ পায় না, এটা খুবই কষ্টদায়ক ও ক্ষতিকর। এর জীবাণু পুরো মুখে ছড়িয়ে পড়ে মুখকে আক্রান্তস্থলে পরিণত করে। ফলে খাবার গ্রহণ মুশকিল হয়ে পড়ে। প্রতিদিন নিয়মিত মিসওয়াক করলে এবং লালা মুখের ভেতর উত্তমরূপে মিশে গেলে এ রোগ হয় না।

মানুষের অমূল্য সম্পদ হচ্ছে দৃষ্টিশক্তি। দাঁতের অপরিচ্ছন্নতা চোখের বিভিন্ন রোগের কারণ। কেননা দাঁতের সঙ্গে চোখের বিশেষ সংযোগ রয়েছে। তাই দাঁত আক্রান্ত হলে চোখও আক্রান্ত হয় এবং দৃষ্টিশক্তি কমতে থাকে। যার দরুন এক সময় চোখের জ্যোতি নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু নিয়মিত মেসওয়াক করলে এ ধরনের রোগ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

সুন্নতকে জীবিত করা ও বিদআতকে ঘৃণা করা

সাহাবায়ে কেরাম তালীম-তারবিয়ত, দাওয়াত-তাবলীগ, ওয়ায-নসীহত এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ, এমনকি প্রয়োজনে জিহাদ ও কিতালের মাধ্যমেও নবী-আদর্শের প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন। তাঁরা সব ধরনের চিন্তাগত, বিশ্বাসগত, কর্ম ও প্রথাগত বিদআত এবং সকল প্রকার জাহেলী রীতিনীতিকে পুরোপুরি ঘৃণা করতেন এবং তা নির্মূলের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন।

অথচ এসব ক্ষেত্রে আমাদের সাধারণ অবস্থা তো আমাদের সামনেই আছে। এই বিষয়ে যৎসামান্য মেহনত যা হচ্ছে তা পরিমাণ ও গুণগতমান দু’দিক থেকেই আরো অগ্রসর করা অপরিহার্য।

নবীজির জীবনের সুন্নত এর বাস্তব রূপ:

মহানবী (সা.)-এর জীবন ও আদর্শ সব স্তরের মানুষের জন্য অনুসরণীয়। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'অবশ্যই তোমাদের প্রত্যেকের জন্য রাসুল (স.)-এর মধ্যেই রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ' (সুরা আহজাব: ২১)।

আল্লাহ তায়ালা আরও ইরশাদ করেন, 'আর আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের প্রতি (অর্থাৎ স্বীয় উম্মতের প্রতি) কোমলহৃদয় হয়েছেন। যদি আপনি কর্কশভাষী ও কঠোর হৃদয়ের হতেন, তাহলে তারা আপনার পাশ থেকে সরে যেত। (সুরা আলে ইমরান: ১৫৯)। ে

আরেক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত। (সুরা কলম: ০৪) আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, নিশ্চয়ই আমি চারিত্রিক গুণাবলি পরিপূর্ণ করার জন্য প্রেরিত হয়েছি। (মুসনাদে আহমদ: ৮৯৩৯)

হজরত ইয়াযীদ ইবনে বাবনুস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা রা.–এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললাম, হে উম্মুল মুমিনীন! **রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম**–এর চরিত্র কেমন ছিল? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর চরিত্র ছিল কোরআন। তারপর বলেন, তোমরা কি সূরা মুমিনূন পড়ো না ? আমরা বললাম, হ্যাঁ, পড়ি। তিনি বলেন, পড়ো, তখন আমি পড়লাম,

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ
وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ

'অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মুমিনগণ; যারা বিনয়–নম্র নিজেদের সালাতে; যারা অসার ক্রিয়াকলাপ হতে বিরত থাকে; যারা জাকাত দানে সক্রিয়; যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে।'

তারপর হজরত আয়েশা রা. বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর চরিত্র এমনই ছিল। (আখলাকুন নবী)

আরেক হাদিসে আয়েশা (রা.)-কে নবীজির চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন, 'জেনে রাখো! পুরো কোরআনই হলো রাসুল (সা.)-এর চরিত্র।' অর্থাৎ তিনি ছিলেন আল-কোরআনের বাস্তব নমুনা। (মুসনাদ আহমদ: ২৫৮১৩)

মহানবী (স.) তার স্ত্রীদের প্রতি অত্যন্ত যত্নশীল ছিলেন। তাদের হাসিখুশি থাকার দিকে খুব লক্ষ্য রাখতেন। আয়েশা (রা.) বলেন, এক সফরে তিনি রাসুলুল্লাহ (স.)-এর সঙ্গে ছিলেন। তখন তিনি কিশোরী। রাসুল (স.) সঙ্গীদের বললেন, তোমরা এগিয়ে যাও। অতঃপর তিনি আয়েশা (রা.)-কে বললেন, এসো দৌড় প্রতিযোগিতা করি।

আয়েশা (রা.) বলেন, 'আমি তার সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতা করলাম এবং দৌড়ে তার চেয়ে এগিয়ে গেলাম।' (আস-সুনানুল কুবরা লিন-নাসায়ি: ৮৯৪৫)
আয়েশা (রা.) আরও বলেন, রাসুলুল্লাহ (স.) কখনো ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কোনো প্রকার অশোভনীয় কথা বলতেন না। বাজারেও তিনি উচ্চৈসঃরে কথা বলতেন না। মন্দের প্রতিকার মন্দ দ্বারা করতেন না; বরং ক্ষমা করে দিতেন। অতঃপর কখনো তা আলোচনাও করতেন না। (শামায়েলে তিরমিজি: ২৬৫; মুসনাদে আহমদ: ২৫৪৫৬; শুআবুল ঈমান: ৭৯৪৪ সহিহ ইবনে হিব্বান: ৬৪৪৩)
তিনি হাসিমুখে বিশুদ্ধ, মার্জিত ও সুন্দরভাবে কথা বলতেন। যা দ্রুত শ্রোতাকে আকৃষ্ট করত। আর একেই লোকেরা 'জাদু' বলত। তাঁর উন্নত ও শুদ্ধভাষিতায় মুগ্ধ হয়েই ইয়ামেনের জেমাদ আজদি মুসলমান হয়ে যান। (মুসলিম: ৮৬৮ (৪৬); মেশকাত: ৫৮৬০)
হজরত আয়েশা (রা.) বলেন, 'রাসুলুল্লাহ (স.)-কে যখনই দুটি কাজের এখতিয়ার দেওয়া হতো, তখন তিনি সহজটি বেছে নিতেন। যদি তাতে গুনাহের কিছু না থাকত। তিনি নিজের জন্য কোনো অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতেন না। কিন্তু আল্লাহর জন্য হলে প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়তেন না'। (বুখারি: ৬১২৬; মুসলিম: ২৩২৭; মেশকাত: ৫৮১৭ 'ফাযায়েল ও শামায়েল।
উত্তম আচার-আচরণ ও চারিত্রিক মাধুর্যতার দ্বারা মানুষের মাঝে যতটা প্রভাব বিস্তার করা যায় তা অন্য কিছুতেই সম্ভব নয়। রাসূল সা. তাঁর উত্তম আখলাক ও সুনিপুণ ব্যবহার দ্বারা সর্বকালের অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় আদর্শ ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন। তাঁর অসাধারণ চারিত্রিক মাধুর্য ও অনুপম ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি দিয়ে পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।' (সূরা আহযাব: ২১) অপর একটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি।' (সূরা আম্বিয়া: ১০৭) তৎকালীন অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে তিনি অবিস্মরণীয় ক্ষমা, মহানুভবতা, বিনয়-নম্রতা, সত্যনিষ্ঠতা প্রভৃতি বিরল চারিত্রিক মাধুর্য দিয়েই বর্বর আরব জাতির আস্থাভাজন হতে সক্ষম হয়েছিলেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সা.। সমগ্র সৃষ্টির জন্যই তিনি আল্লাহর রহমত। এ বিশ্বে তাঁর মত অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব, অনুপম চরিত্র, মধুর স্বভাবের মানুষ কেউই আসেননি। তাঁর অনুপম জীবনাচরণ, চারিত্রক সৌন্দর্য ও মাধুর্যতার কিছু আকর্ষণীয় দিক তুলে ধরা হলো-
কোমল ও নমনীয় ব্যবহার: রাসূল সা. এতই কোমল ও নমনীয় ব্যবহারের অধিকারী ছিলেন যে তাঁর পবিত্র সংশ্রব কিংবা সামান্যতম সুদৃষ্টির কারণেও অনুসারীরা তাঁকে

প্রাণাধিক ভালোবাসত এবং মনে-প্রাণে গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করত। তাঁর কোমল ব্যবহার সম্পর্কে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) বলেন, 'নবী করিম সা. কঠোর ভাষী ছিলেন না, এমনকি প্রয়োজনেও তিনি কঠোর ভাষা প্রয়োগ করতেন না। তাঁর মধ্যে আদৌ প্রতিশোধ প্রবণতা ছিল না। মন্দের প্রতিবাদ তিনি মন্দ দিয়ে করতেন না, বরং মন্দের বিনিময়ে তিনি উত্তম আচরণ করতেন। সব বিষয়েই তিনি ক্ষমাকে প্রাধান্য দিতেন। তিনি এতটা বিনয়ী ও নম্র ছিলেন যে কথা বলার সময় কারও মুখগুলের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কথা বলতেন না। কোনো অশোভন বিষয় উল্লেখ করতেন না।' ইবরাহিম ইবনে মুহাম্মদ (রা) থেকে বর্ণিত, 'আলী (রা) যখন রাসূল সা.-এর চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতেন তখন বলতেন, তিনি যখন পথ চলতেন তখন পা তুলে এমনভাবে চলতেন যে, মনে হতো তিনি যেন উঁচু স্থান হতে নিচে অবতরণ করছেন।' (শামায়েলে তিরমিযি: ৯৩) তাঁর চরিত্র ছিল সর্বোত্তম মানবিক গুণাবলীতে বিভূষিত। তিনি মানবতার সর্বোত্তম আদর্শ। তিনি সব সময় সকল মানুষের সাথে বিনম্র আচার-আচরণ করতেন। সকলকেই তিনি তাঁর অমায়িক ব্যবহার দ্বারা আকৃষ্ট করতেন। তাঁর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলে বিমোহিত হতেন।

সদা হাস্যোজ্জ্বল ও সদালাপী: তিনি সব সময় মানুষের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলতেন ও সদালাপ করতেন। তাঁর মধুর বচনে সবাই অভিভূত হতো। আবদুল্লাহ ইবনে হারিস (রা) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ সা. মুচকি হাসতেন।' (শামায়েলে তিরমিযি : ১৬৯) অপর একটি হাদীস, আবদুল্লাহ ইবনে হারিস (রা) থেকে বর্ণিত, 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে অধিক মুচকি হাস্যকারী ব্যক্তি কাউকে দেখিনি।' (শামায়েলে তিরমিযি: ১৬৮) তাঁর অভিভাষণ শুনে জনসাধারণ অশ্রু সংবরণ করতে পারত না। তিনি জনগণকে উপদেশ দিয়ে বলেছেন, 'দয়ালু প্রভু আল্লাহর ইবাদত করো, ক্ষুধার্তকে খাদ্য প্রদান করো, সালামের বহুল প্রচলন করো এবং এসব কাজের মাধ্যমে বেহেশতে প্রবেশ করো।' একদা এক ব্যক্তি নবী করিম সা.-কে ইসলামে সবচেয়ে ভালো কাজ কোনটি প্রশ্ন করলে তিনি উত্তরে জানালেন, 'অভুক্তকে খাওয়ানো আর চেনা-অচেনা সবাইকেই সালাম করা।' (বুখারি ও মুসলিম)

মায়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন: পৃথিবীতে উত্তম ব্যবহারের সবচেয়ে বেশি হকদার হলেন মা। রাসূল সা. ছোট বয়সেই তাঁর মাকে হারান। তবে তিনি মাতৃতুল্য সবাইকে মায়ের মতো সম্মান করতেন। রাসূল সা. তাঁর দুধমাতা হালিমা (রা)-কে কিরূপ সম্মান প্রদর্শন করতেন এ ব্যাপারে একটি ঘটনার বর্ণনা দিয়ে আবু তুফাইল (রা) বলেন, 'আমি রাসূল সা.কে আল-জিইরানা নামক স্থানে গোশত বণ্টন করতে দেখেছি। আবু তুফাইল (রা) বলেন, 'তখন আমি যুবক ছিলাম এবং উটের হাড় বহন করছিলাম। এ

সময় এক মহিলা এলেন। তখন রাসূল সা. ওই মহিলার সামনে তাঁর গায়ের চাদর বিছিয়ে দিলেন। তিনি তাঁর ওপর বসলেন। আমি বললাম, ইনি কে? সাহাবীরা বললেন, ইনি হলেন তাঁর দুধমাতা।' (সহীহ মুসলিম: ৫১৪৪)

অধীনস্থদের সাথে আচরণ: তিনি তাঁর অধীনস্থ কাজের লোকদের সঙ্গে যে ব্যবহার করেছেন, তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। তাদের ভাই বলে স্বীকৃতি দিয়ে শ্রমজীবী মানুষের মতো সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন, 'তারা হচ্ছে তোমাদের ভাই ও তোমাদের খাদেম। মহান আল্লাহ তাদের তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। অতএব তোমাদের যার অধীনে তার ভাই আছে, তাকে তাই খাওয়ানো উচিত যা সে নিজে খায় এবং তাকে তাই পরানো উচিত যা সে নিজে পরে। সামর্থ্যরে বাইরের কাজের বোঝা তাদের ওপর চাপিয়ে দিয়ো না। আর এ ধরনের কাজের বোঝা তাদের ওপর চাপিয়ে দিলে তবে তাদের সাহায্য করো।' (সহীহ বুখারি: ১৩৬০) তিনি কখনো কোনো কাজের লোককে কষ্ট দেননি। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, 'আমি একটানা দশটি বছর রাসূল সা.-এর সেবায় নিয়োজিত ছিলাম। এই সুদীর্ঘ সময়ে রাসূল কখনোই আমার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করে উফ শব্দটুকু উচ্চারণ করেননি। আমার কোনো কাজ দেখে কখনো বলেননি, তুমি এ কাজ করলে কেন? কিংবা কাজ না করলে কখনো বলেননি, তুমি এ কাজ করলে না কেন? (সহীহ বুখারি: ৫৬৯১) এ জন্যই মহানবীর চরিত্রকে মানবজাতির জন্য শ্রেষ্ঠ আদর্শ হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

উদারতা ও মহানুভবতা: রাসূল সা. ছিলেন উদারতা ও মহানুভবতার মূর্তপ্রতীক। উদারতায় সুশোভিত ব্যক্তির জন্য তিনি রহমতের দোয়া করেছেন। এরশাদ করেছেন, 'বেচাকেনা ও অন্যের প্রয়োজন পূরণে উদার-সহনশীল ব্যক্তিকে আল্লাহ দয়া করুন।' (সহীহ বুখারি) রাসূল সা.কে যখনই দুই কাজের একটি বেছে নেয়ার সুযোগ দেয়া হতো, তিনি অবশ্যই অপেক্ষাকৃত সহজটি বেছে নিতেন- যদি না সেটি গুনাহের কাজ হয়। জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, 'রাসূল সা. ছিলেন সহজপন্থী লোক।' ইমাম নববি (র) বলেন, 'অর্থাৎ সহজ স্বভাব এবং মহৎ চরিত্রের লোক ছিলেন। স্বভাব-সরল সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি ছিলেন। মহানবী সা.-এর জীবনের নানান কাজ-কর্মের মাঝে এ উদারতা ও কোমলতা ফুটে ওঠে, যা দৃশ্যমান হয় তাঁর ইবাদত ও লেনদেনে এবং সঙ্গী-স্বজন ও শত্রু-মিত্রের সঙ্গে তাঁর আচরণ এবং আখলাকে। বুখারি, মুসলিম ও মুসনাদে আহমাদে জাবের (রা)-এর ভাষ্যে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, 'আমরা রাসূল সা. এর সঙ্গে জাতুর রিকা অভিযানে ছিলাম। সুপরিসর ছায়া ছড়ানো এক বৃক্ষের নিচে আমরা রাসূল সা.কে রেখে (নিজেদের মতো বিশ্রামের জন্য) গেলাম। এরই মধ্যে এক

মোশরেক এসে তরবারিসহ তাঁর শিয়রে দাঁড়িয়ে গেল। সে তাঁকে বলল, কে আপনাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করবে? তিনি বলেন, 'আল্লাহ'। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাত থেকে তরবারিটি পড়ে গেল। রাসূল সা. সেটি হাতে তুলে নিলেন। এবার তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাকে কে বাঁচাবে আমার হাত থেকে?' সে বলল, আপনি উত্তম গ্রহণকারী হয়ে যান। জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি সাক্ষ্য দেবে যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই?' সে বলল, না। তবে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আপনার বিরুদ্ধে আমি লড়াই করব না এবং এমন লোকদের সঙ্গীও হবো না, যারা আপনার সঙ্গে লড়াই করে। এ কথা শুনে নবী সা. লোকটিকে ছেড়ে দেন।' বর্ণনাকারী বলেন, লোকটি তারপর নিজের সঙ্গীদের মাঝে ফিরে যায়। তাদের গিয়ে বলে, 'আমি তোমাদের কাছে এসেছি শ্রেষ্ঠতম মানুষের কাছ থেকে।' রাসূল সা. লোকটিকে ইসলাম গ্রহণে জবরদস্তি করেননি। কৃতকর্মের জন্য তাকে শাস্তিও দেননি। ফলে লোকটির হৃদয়ে ইসলাম প্রবেশ করে। তিনি স্বজাতির কাছে ফিরে যান। আল্লাহ তার মাধ্যমে অনেক মানুষকে হেদায়েত দান করেন।

দাস-দাসীদের সাথে সদাচরণ: দাস-দাসীদের প্রতি রাসূলুল্লাহ সা. ছিলেন অত্যন্ত দয়াশীল। তিনি তাঁর ক্রীতদাস জায়েদ বিন হারেস (রা)কে মুক্ত করে দিয়ে পালকপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। জায়েদ বিন হারেস (রা) রাসূল সা.-এর চরিত্রে এমন মুগ্ধ ছিলেন যে, তাঁর বাবা ও চাচা তাকে নিয়ে যেতে চাইলে তিনি রাসূল সা.-এর সঙ্গ ছেড়ে তাদের সঙ্গে যেতে রাজি হননি। দাস-দাসীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে রাসূল সা. অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করতেন। কোনো সাহাবী দাস-দাসীদের সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করলে তিনি তাকে ভর্ৎসনা করতেন এবং তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহারের উপদেশ দিতেন। আল্লাহ তায়ালা তাদের তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। তাই যার ভাই তার অধীনে থাকবে, সে যেন নিজে যা খায় তাকে তা-ই খাওয়ায় এবং নিজে যা পরিধান করে, তাকেও তা-ই পরায়। তাদের ওপর এমন কাজ চাপিয়ে দিও না, যা তাদের জন্য অধিক কষ্টদায়ক। যদি এমন কষ্টকর কাজ করতে দাও, তাহলে তোমরাও তাদের সে কাজে সহযোগিতা করবে।' (সহীহ বুখারি : ৩০)

শিশুদের প্রতি স্নেহ ও মমতা: প্রিয়নবী ছোটদের অনেক ভালবাসতেন, অনেক আদর করতেন। তিনি শিশুদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন, কোলে তুলে নিতেন। তাদের জন্য দু'আ করতেন। শিশুরাও নবীজীকে অনেক আপন মনে করত। তাঁকে ঘোড়া বানিয়ে খেলা করত। কাঁধে চড়ত, পিঠে চড়ত। তুমি যদি নবীজীকে দেখতে তুমিও তার কোলে উঠতে চাইতে, নবীজী তোমাকেও আদর করে কোলে তুলে নিতেন। আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সা.-এর চাইতে শিশুদের

প্রতি বেশি দয়াশীল আর কাউকে আমি দেখিনি। (সহীহ মুসলিম: ৫৯২০) নবীজী নিজে যেমন শিশুদের আদর করতেন, তাঁর উম্মতকেও বলে গেছেন- শিশুদের আদর করতে। হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, 'নবী কারীম সা. তাঁর নাতি হাসানকে চুমু খেলেন। সেখানে আকরা ইবনে হাবিস নামে এক সাহাবী বসা ছিলেন। হাসানকে চুমু খাওয়া দেখে তিনি বললেন, আমার দশটি সন্তান রয়েছে। আমি তাদের কাউকে চুমু খাইনি। নবীজী তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, যে দয়া করে না, তাঁর প্রতিও দয়া করা হবে না।' (সহীহ বুখারী: ৫৬৫১, সহীহ মুসলিম: ৬৫)

যুবকদের প্রতি মমত্ববোধ: যুবকদের বেয়াদবিপূর্ণ কথা শুনেও রাসূলুল্লাহ সা. তাদের ধমক দিতেন না। বরং তাদের অত্যন্ত কোমল ভাষায় উপদেশ দিতেন ও বোঝানোর চেষ্টা করতেন এবং তাদের জন্য দোয়া করতেন। তাঁর হিকমতপূর্ণ আচরণে বিপথগামী যুবকরাও সুপথে ফিরে আসত। এ সম্পর্কে একটি ঘটনা বর্ণনা করে হযরত আবু উমামা (রা) বলেন, একদিন এক যুবক রাসূল সা.-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে ব্যভিচার করার অনুমতি দিন!' এ কথা শুনে লোকেরা তাকে ধমক দিয়ে বলল, থামো, থামো! (এ কী বলছ তুমি?)। কিন্তু রাসূল সা. তাকে বললেন, 'আমার কাছে এসো। সে তাঁর কাছে এসে বসলে তিনি তাকে বললেন, তুমি কি নিজ মায়ের জন্য তা পছন্দ করো? সে বলল, না, আল্লাহর কসম! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য কোরবান করুন। তিনি বললেন, তাহলে লোকেরাও তো তাদের মায়েদের জন্য তা পছন্দ করে না। অতঃপর তিনি বললেন, তাহলে তুমি কি তোমার মেয়ের জন্য তা পছন্দ করো? সে বলল, না, আল্লাহর কসম! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য কোরবান করুন। তিনি বললেন, তাহলে লোকেরাও তো তাদের মেয়েদের জন্য তা পছন্দ করে না। অতঃপর তিনি বললেন, তাহলে তুমি কি তোমার বোনের জন্য তা পছন্দ করো? সে বলল, না, আল্লাহর কসম! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য কোরবান করুন। তিনি বললেন, তাহলে লোকেরাও তো তাদের বোনেদের জন্য তা পছন্দ করে না।... অতঃপর তিনি তাঁর বুকে হাত রাখলেন এবং তাঁর জন্য দোয়া করে বললেন, হে আল্লাহ! তুমি তার গোনাহ মাফ করে দাও, তার হৃদয়কে পবিত্র করে দাও এবং তাকে ব্যভিচার থেকে রক্ষা করো।' বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর সেই যুবক আর ব্যভিচারের দিকে ভ্রুক্ষেপও করেনি। (মুয়াত্তা ইমাম মালিক: ১৬৫৫)

শিক্ষাদানে কোমলতা: রাসূল সা. পাঠদানের সময় থেমে থেমে কথা বলতেন। যেনো তা গ্রহণ করা শ্রোতা ও শিক্ষার্থীদের জন্য সহজ হয়। খুব দ্রুত কথা বলতেন না যেনো শিক্ষার্থীরা ঠিক বুঝে উঠতে না পারে আবার এত ধীরেও বলতেন না যাতে কথার ছন্দ হারিয়ে যায়। বরং তিনি মধ্যম গতিতে থেমে থেমে পাঠদান করতেন। হযরত আবু

বকর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল সা. বলেন, 'তোমরা কি জানো- আজ কোন দিন? ...এটি কোন মাস? ...এটি কী জিলহজ নয়?...এটি কোন শহর?' (সহীহ বুখারি: ১৭৪১)

বিধবা ও এতিমদের প্রতি দরদ: ইসলামপূর্ব যুগে এতিম ও বিধবাদের কোনো অধিকার সমাজে প্রতিষ্ঠিত ছিল না। বাবা মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অসহায় সন্তানদের প্রতি শুরু হতো অত্যাচার-অবিচার ও জুলুম-নিপীড়ন। তাদের অধিকার দেওয়া তো হতোই না, বরং এতিম শিশুদের জন্য বাবার রেখে যাওয়া সম্পদ কেড়ে নেওয়ার জন্য শুরু হতো ষড়যন্ত্র। অনুরূপভাবে স্বামী মারা যাওয়ার পর বিধবা স্ত্রী মানুষের কটু কথার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হতো। স্বামীহারা অসহায় নারী অপমান ও লাঞ্ছনার শিকার হয়ে জীবন-যাপন করত। প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, বিধবা ও অসহায়দের যারা অভিভাবক হবে এবং দায়-দায়িত্ব পালন করবে তাদের সম্পর্কে রাসূল সা. বলেন, 'বিধবা ও অসহায়দের তত্ত্বাবধানকারী ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জেহাদকারীর মতো।' হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী বলেন, আমার ধারণা রাসূল সা. এও বলেছেন যে, '(বিধবা ও অসহায়দের তত্ত্বাবধানকারীর মর্যাদা) ওই ব্যক্তির মতো, যে অলসতা না করে সারা রাত জেগে ইবাদত করে এবং ধারাবাহিকভাবে প্রতিদিন রোজা রাখে।' (বুখারি ও মুসলিম) অন্য হাদীসে আছে- 'যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোনো এতিমের মাথায় হাত বুলাবে যেসব চুলের ওপর দিয়ে তাঁর হাত অতিক্রম করবে এর প্রতিটির বিনিময়ে তার জন্য সওয়াব লেখা হবে।' (মুসনাদে আহমদ, তিরমিজি)

পরিবারের জন্য আন্তরিকতা: আমাদের রাসূল সা.-এর বাস্তব জীবনী ছিলো মার্জিত, প্রীতিময়, ভালোবাসাপূর্ণ আবেগঘন ও হাসি রসিকতার। তাঁর একাধিক স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও কারো কাছ থেকে এমন কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি যে, তিনি তাদের সাথে কর্কশ রূঢ় ব্যবহার করেছেন। তিরমিযি শরীফের এক হাদীসে রাসূল সা. নিজেই বলেন, 'তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম সে যে তার পরিবার পরিজনের কাছে সর্বোত্তম। আমি আমার পরিবার পরিজনের কাছে সর্বোত্তম।' (তিরমিযি) তাঁর পরিবার থেকে শুনে নেওয়া যাক তিনি কেমন ছিলেন, কিরূপ ছিল স্ত্রীদের সাথে তাঁর আচার ব্যবহারের সীমারেখা। বুখারি শরীফের এক বর্ণনায় রয়েছে হযরত আমরাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আয়েশা (রা)কে জিজ্ঞেস করা হলো, রাসূল সা. ঘরে অবস্থানকালে কী করতেন? জবাবে তিনি বললেন, রাসূল সা. ছিলেন একজন মানুষ। পোশাকের মধ্যে তিনি উকুন তালাশ করতেন, ছাগল দোহন করতেন এবং নিজের কাজ নিজেই সম্পন্ন করতেন। আর ইবাদতের সময় হলে উঠে চলে যেতেন।' (শামায়েলে তিরমিযি: ২৬৩) এর থেকে আমরা বুঝতে পারি উম্মাহাতুল মুমিনদেরকে তিনি সদা সর্বদা ঘরোয়া

কাজের বিষয়ে প্রচুর সাহায্য করতেন। শুধু এতোটুকু নয়। স্ত্রীদের সাথে হাসি রসিকতা করতেন যাতে পূর্ণ ভালোবাসার সৃষ্টি হয়। হযরতের একাধিক স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও প্রতিদিন তাদের খোঁজ-খবর নিতেন। হযরত আয়েশা (রা)-এর সাথে রাসূল সা. দৌড় প্রতিযোগিতার কথাতো সকলের কাছেই প্রসিদ্ধ। একজন স্বামী আর স্ত্রীর মাঝে কতোটা মধুময় সম্পর্ক হলে খেলা করে! একবার রাসূল সা. হারতেন অন্যবার জিততেন। এভাবে রাসূলুল্লাহ সাংসারিক জীবন সুখী ও ছন্দময় করে তুলেন।

সাদাসিধে জীবনযাপন: সৃষ্টির সেরা মানুষ হয়েও তিনি বিলাসিতামুক্ত অত্যন্ত সাদাসিধে ও অনাড়ম্বর জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। রাসূল সা. গাছের লতা-পাতা দিয়ে তৈরি করা বিছানায় ঘুমাতেন। এতে তাঁর শরীর মুবারকে দাগ হয়ে যেত। সাহাবারা ভালো কোনো বিছানার ব্যবস্থা করার আবদার জানালে তার প্রতি-উত্তরে তিনি বলতেন, 'আমার দুনিয়ার প্রতি কোনো আকর্ষণ নেই। আমি দুনিয়াতে একজন পথচারী ছাড়া আর কিছুই নই। যে পথচারী একটা গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে একটু পরে সেটা ছেড়ে চলে যায়।' (তিরমিজি: ২৩৭৭)

সাহাবীদের প্রতি দরদ: রাসূল সা. সাহাবীদের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত কোমল হৃদয়। আল্লাহর হুকুম হদ, কিসাস ইত্যাদি পালনের ব্যাপারে কঠোর হলেও ব্যক্তিগত কারণে কারও সাথে কখনও কঠোর ব্যবহার করেননি। তাই সাহাবীরা রাসূল সা.কে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসতেন এবং তাঁর সান্নিধ্য লাভে নিজেদের ধন্য মনে করতেন। এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন। পক্ষান্তরে আপনি যদি রাগী ও কঠিন হৃদয়সম্পন্ন হতেন তাহলে তাঁরা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত।' (সূরা আলে ইমরান: ১৫৯)

জীব-জন্তুর প্রতি অনুকম্পা: রাসূল সা.-এর অনুকম্পা শুধুমাত্র মানবজাতির প্রতিই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং জীব-জন্তু ও জড়পর্দাথের প্রতিও ছিল বিশেষ মায়া। রাসূল সা.-এর কতিপয় বাণী এবং তদ্বিষয়ে কিছু আলোচনাতে এটি সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এক হাদীসে নবী সা. বলেন, 'যে ব্যক্তি একটি বৃক্ষরোপণ করল অথবা কোন ফসল উৎপাদন করল, আর উক্ত বৃক্ষের ফল বা ফসল কোন মানুষ বা কোন চতুষ্পদ জন্তু বা কোন হিংস্র জন্তু বা কোন পাখি ভক্ষণ করল তাহলে সে ব্যক্তির জন্য উহা সাদকাহ হিসেবে পরিগণিত হবে।' (মুসনাদে আহমাদ : ১৫২৩৫) উক্ত হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, কারো রোপণকৃত বৃক্ষ হতে কোন ফল বা উৎপাদিত ফসল হতে কোন ফসল যদি কুকুর, শৃগাল, বিড়াল বা এ জাতীয় কোন পশু বা কীটপতঙ্গ খায় তাহলে সে জন্যও সে সওয়াব পাবে। কাজেই মানুষের উচিত রাস্তার মোড়ে মোড়ে এ নিয়তে ফলদার গাছ লাগানো। জীবকে কষ্ট দেয়া অমানবিক ও গর্হিত কাজ বলে রাসূল সা.

সাব্যস্ত করেছেন। তিনি বলেন, ‘একজন স্ত্রীলোক একটি বিড়ালকে বেঁধে রেখেছিল। অতঃপর অনাহারে বিড়ালটি মারা যায়। এ অপরাধে স্ত্রীলোকটিকে শাস্তি দেয়া হয় এবং জাহান্নামি বলে ঘোষণা দেয়া হয়। সে উহাকে বেঁধে রেখেছিল, অথচ তাকে আহারও করায়নি, পানও করায়নি। অপরপক্ষে তাকে ছেড়ে দেয়নি, যাতে সে জমিনের লতা-পাতা খেয়ে বাঁচত।’ (সহীহ মুসলিম : ৫৯৮৯) রাসূল সা.-এর যুগে ভ্রমণের জন্য একমাত্র যানবাহন ছিল জন্তু। জন্তুকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কষ্ট দেয়াও অমানবিক। তাই রাসূল সা. কোন জন্তুর ওপর আরোহণ করত কারো সাথে কথা বলে বা অন্য কোন প্রয়োজনে সময় নষ্ট করে জন্তুকে কষ্ট না দিতে কঠোরভাবে নিষেধ করেন। রাসূল সা. বলেন, ‘তোমরা সুস্থ অবস্থায় এ সমস্ত পশুদের ওপর আরোহণ কর এবং সুস্থ অবস্থায় এদেরকে ছেড়ে দাও। আর তোমরা সেগুলোকে চেয়ারে পরিণত কর না।’ (মুসনাদে আহমাদ: ১৫৬৭৯) পশুদেরকে অভুক্ত রাখা এবং তাদেরকে দুর্বল ও কৃশকায় করে তোলাও সমীচীন নয়। এ ব্যাপারে সাহল ইবনুল হানযালিয়্যাহ আল আনসারী (রা) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীস প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, ‘একদা রাসূল সা. একটি উটের নিকট দিয়ে গমন করছিলেন। তিনি দেখলেন ক্ষুধায় উটটির পেট পিঠের সাথে লেগে গেছে। এ অবস্থা দেখে রাসূল সা. বললেন- এসব নির্বাক পশুদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। এরা কথা বলতে পারে না এবং প্রয়োজন ব্যক্ত করতে পারে না, এরা যখন আরোহী বহনের যোগ্যতা রাখে তখন তাদের পিঠে আরোহণ কর এবং সুস্থ অবস্থায় তাদেরকে ছেড়ে দাও।’ (সুনানে আবু দাউদ: ২৫৪৮ ও ২৫৫০)

রাসূল সা.-এর ন্যায়পরায়ণতা: ন্যায়পরায়ণতা মানব চরিত্রের এক উৎকৃষ্ট ও অত্যাবশ্যকীয় বিশেষ গুণ। প্রিয় নবী সা. এ গুণ ও চরিত্রের সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত। হাদীস ও ইতিহাসের গ্রন্থগুলোতে এ সম্পর্কে বহু ঘটনাবলি উল্লিখিত রয়েছে। একদা মাখযুমিয়্যাহ নাম্মী জনৈকা নারী চুরি করল। সে ছিল অভিজাত পরিবারের সদস্য। তাই সাহাবাদের কারো কারো নিকট তার ওপর হাত কর্তনের মত দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন করা কঠিন মনে হলো। তখন উসামা বিন যায়েদ (রা) তাদের প্রতিনিধি হয়ে রাসূল সা.-এর কাছে এসে তার ব্যাপারে সুপারিশ করলেন। জবাবে রাসূল সা. বললেন, ‘তুমি কি আল্লাহ কর্তৃক অবধারিত দণ্ডবিধি মওকুফের ব্যাপারে সুপারিশ করছো হে উসামা! আল্লাহর কসম! মুহাম্মদের মেয়ে ফাতেমাও যদি চুরি করে অবশ্যই আমি তার হাত কেটে দেব।’ (সহীহ মুসলিম: ৩১৯৬) অপর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব বদর যুদ্ধে বন্দী হয়েছিলেন। তিনি রাসূল সা.-এর চাচা হওয়ার সুবাদে আনসারগণ বিনা মুক্তিপণে ছেড়ে দেওয়ার আবেদন করলেন। কিন্তু রাসূল সা.

বললেন, ‘না, তাঁর জন্য এক দিরহামও ছাড় দিয়ো না।’ এ-দ্বারা রাসূলের লক্ষ্য হচ্ছে, যাতে সবার সাথে সমান আচরণ হয়, কোনভাবেই স্বজনপ্রীতি প্রকাশ না পায়।

মানবকল্যাণই রাসূল সা.-এর মূলমন্ত্র: মানুষের কল্যাণ সাধনই ছিল মহানবী সা.-এর জীবনের মূলমন্ত্র। আল্লাহপাক তাঁকে মানুষের নবী করে মানবকল্যাণের পরিপূর্ণ আদর্শরূপে প্রেরণ করেছেন। বস্তুত তিনি সর্বকালের শ্রেষ্ঠতম পথিকৃৎ, তিনি বিশ^মানবতার শ্রেষ্ঠতম আদর্শ। ‘হে নবী, আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। আর আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহবানকারী ও আলোকদীপ্ত প্রদীপ হিসেবে।’ (সূরা আহজাব : ৪৫-৪৬) রাসূল সা.-এর চরিত্র কত মহান ছিল তা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিম্নোক্ত ঘোষণা থেকে বুঝা যায়, যেখানে আল্লাহ বলেছেন, ‘যে রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল।’ (সূরা নিসা: ৮০) এমনকি আল্লাহকে ভালোবাসতে হলে, আল্লাহকে পেতে হলে, রাসূল সা.-কে ভালোবেসে তাঁকে অনু্ুসরণ করেই তা করতে হবে। অন্য কোন পথে নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু’। (সূরা আলে ইমরান : ৩১) জারীর ইবনু আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসূল সা. বলেছেন, যে লোক মানুষের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে না (কিয়ামতের দিন) আল্লাহও তাঁর প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন না।’ (সহীহ মুসলিম : ৫৯২৪)

সহনশীলতা, নম্রতা ও ধৈর্যশীলতা: পৃথিবীর সকল মানুষের মধ্যে রাসূল সা.-এর ধৈর্য, সহনশীলতা ও নম্রতার প্রকাশ ছিল সবচেয়ে বেশি। রাসূল সা. হকদারের ন্যায়সঙ্গত হক আদায় ও তার সহায়তার নিমিত্তে ন্যায়ের মানদণ্ড নির্ধারণ করেছেন। যেন তারা তাদের হক বুঝে পায় ও তা গ্রহণ করে। আল্লাহ তা‘আলা আমাদের নবী সা.-কে ন্যায় ও সত্যের পথে আদেশ ও নিষেধের যে আদর্শ দান করেছেন, তা তিনি বাস্তবায়ন করেছেন। আমরা নবী সা.-এর ঘরে কোন কঠোরতা, জবরদস্তি ও জুলুম-অত্যাচারের আশঙ্কা করি না। আশঙ্কা নেই সেখানে কোন সীমালঙ্ঘন ও লুটপাটের। আয়েশা (রা) বলেন, ‘রাসূল সা. এক জিহাদের ময়দান ব্যতীত তাঁর হাত দিয়ে কাউকে মারেননি, এমনকি তাঁর স্ত্রী ও খাদেমকেও না। তাঁকে কোন ব্যাপারে প্রতিশোধ নিতে দেখিনি, তবে কেউ আল্লাহর বিধানের অবমাননা করলে তিনি আল্লাহর হকের জন্যই প্রতিশোধ নিতেন।’ (মুসনাদে আহমাদ: ২৫৭১৫) আনাস (রা) বলেন, ‘আমি রাসূল সা.-এর সাথে চলছিলাম, তাঁর গায়ে ছিল মোটা ঝালর যুক্ত নাজরানি চাদর। অতঃপর এক বেদুইন তাকে ধরে সজোরে টানতে লাগল, আমি তাকিয়ে দেখি তাঁর ঘাড়ে জোরে টানের

চোটে চাদরের ঝালরের দাগ লেগে গেছে। তারপর বেদুইন বলে উঠল: হে মুহাম্মাদ! তোমার কাছে যে সম্পদ আছে, তা আমাকে দেয়ার আদেশ দাও। তিনি তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসলেন ও তাকে দেয়ার আদেশ দিলেন।' (মুসলিম: ২৩২৮) কতই না সুন্দর তাঁর আচরণ এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের চিত্র। প্রতিটি ক্ষেত্রেই নমনীয়তা এবং উপকারী ও কল্যাণজনক বিষয়কে বুঝান ও অন্যায় অকল্যাণকে প্রতিকার করাই ছিল তাঁর কর্ম। মূর্খ বেদুইন সাহাবী যাদের আদব-কায়দা সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞান নেই তাদের সঙ্গেও রাসূল সা. অত্যন্ত কোমল আচরণ করতেন। এরূপ এক বেদুইন সাহাবীর সঙ্গে রাসূল সা.-এর আচরণ সম্পর্কে হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, 'একদিন এক বেদুইন মসজিদের ভেতর প্রস্রাব করা আরম্ভ করলে, সাহাবীরা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। অতঃপর নবী সা. বললেন, তোমরা তাকে বারণ করো না, ছেড়ে দাও এবং প্রস্রাবের জায়গায় এক বালতি পানি ঢেলে দাও। নিশ্চয়ই তোমরা সহজতা আরোপকারী হিসাবেই প্রেরিত হয়েছ, কঠোর হয়ে প্রেরিত হওনি।' (সহীহ বুখারি: ৬১২৮)

দাওয়াতি কাজে রাসূল সা.-এর ধৈর্য: দাওয়াতি কাজে রাসূল সা. যে ধৈর্য, তাঁর অনুসারী দাবিদারদের জন্য অপরিহার্য হলো সে অনুযায়ী তাঁর আদর্শ মতো চলা এবং নিজেকে অধৈর্যের মুখে ঠেলে না দেয়া। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, 'একবার তিনি নবী সা.-কে জিজ্ঞেস করলেন, উহুদের দিনের চেয়ে কঠিন কোনদিন কি আপনার ওপর এসেছিল? তিনি বললেন, আমি তোমার কওম হতে যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছি, তাতো হয়েছি। তাদের হতে অধিক কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয়েছি, আকাবার দিন যখন আমি নিজেকে ইব্নু 'আবদে ইয়ালিল ইবনে 'আবদে কলালের নিকট পেশ করেছিলাম। আমি যা চেয়েছিলাম, সে তার জবাব দেয়নি। তখন আমি এমনভাবে বিষন্ন চেহারা নিয়ে ফিরে এলাম যে, কারনুস সাআলিবে পৌঁছা পর্যন্ত আমার চিন্তা দূর হয়নি। তখন আমি মাথা ওপরে উঠালাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম এক টুকরো মেঘ আমাকে ছায়া দিচ্ছে। আমি সেদিকে তাকালাম। তার মধ্যে ছিলেন জিবরাইল (আ)। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, আপনার কওম আপনাকে যা বলেছে এবং তারা উত্তরে যা বলেছে তা সবই আল্লাহ শুনেছেন। তিনি আপনার নিকট পাহাড়ের ফেরেশতাকে পাঠিয়েছেন। এদের সম্পর্কে আপনার যা ইচ্ছে আপনি তাকে হুকুম দিতে পারেন। তখন পাহাড়ের ফেরেশতা আমাকে ডাকলেন এবং আমাকে সালাম দিলেন। অতঃপর বললেন, 'হে মুহাম্মাদ সা.! এসব ব্যাপার আপনার ইচ্ছাধীন। আপনি যদি চান, তাহলে আমি তাদের ওপর আখশাবাইন (দু'টি কঠিন শিলার পাহাড়)কে চাপিয়ে দিব। উত্তরে নবী সা. বললেন, বরং আশা করি মহান আল্লাহ তাদের বংশ থেকে এমন সন্তান জন্ম

দেবেন যারা এক আল্লাহর ইবাদত করবে আর তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করবে না।' (সহীহ বুখারী: ৩২৩১) বর্তমানে অনেকেই দাওয়াতি কাজে তাড়াহুড়া করে থাকে এবং অতি দ্রুত এ কাজের ফলাফল পেতে চায়। ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমি যেন রাসূল সা.-কে কোন এক নবীর ঘটনা বর্ণনা করতে দেখছি তিনি বলেন, 'সে নবীর সম্প্রদায় তাঁকে মেরে রক্তাক্ত করে দিয়েছে, তিনি মুখমণ্ডল থেকে রক্ত মোছা অবস্থায় বলছে, হে আল্লাহ! তুমি আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করে দাও। কেননা তাঁরা বুঝে না।' (সহীহ বুখারী: ৬৯২৯)।

ব্যক্তি জীবনে সুন্নতের ভূমিকা:

ব্যক্তি জীবনে সুন্নাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুন্নাত হলো নবীর (সা.) এর কথা, কাজ, এবং অনুমোদনযোগ্য সব কর্মপদ্ধতি। এটি শুধু ইবাদতের ক্ষেত্রেই নয়, বরং ব্যক্তিগত জীবনযাপনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, যেমন- আচার-আচরণ, খাওয়া-দাওয়া, কথা বলা, ঘুম ইত্যাদি অনুকরণ করার মাধ্যমে জীবনকে সুন্দর ও সুখময় করে তোলে। সুন্নাতের ভূমিকা:

- **আদর্শ অনুসরণ:**
  সুন্নাত অনুসরণ করে মানুষ একটি সুন্দর ও আদর্শ জীবন যাপন করতে পারে। হজরত মুহাম্মাদ (সা.) এর জীবন ছিল একটি আদর্শ জীবন, যা অনুকরণযোগ্য।
- **ধর্মীয় অনুশাসন:**
  সুন্নাত শুধু ব্যক্তিগত জীবনকে সুন্দর করে না, বরং এটি ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে উৎসাহিত করে, যা পরকালের জন্য প্রস্তুতিতে সাহায্য করে।
- **সঠিক পথনির্দেশনা:**
  সুন্নাত সঠিক জীবনযাপন এবং কাজের পথ দেখায়, যা মানুষকে ভুল পথে যাওয়া থেকে রক্ষা করে।
- **ইহকাল ও পরকালের উন্নতি:**
  সুন্নাত অনুসরণ করে ইহকালে সুন্দর জীবনযাপন করা যায়, যা পরকালে ভালো ফল লাভের জন্য সহায়ক।
- **কুরআনের ব্যাখ্যা:**
  সুন্নাত কুরআনের আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা করে এবং ইসলামি আইন ও বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপন করে, যা মানুষের জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করে।

সুন্নাত অনুসরণ করা মানুষের জন্য একটি অপরিহার্য দিক। এটি শুধু আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং একটি জীবনদর্শন যা মানুষকে সঠিক পথে চলতে উৎসাহিত করে।

পারিবারিক জীবনের সুন্নাতের ভূমিকা :

পারিবারিক জীবনে সুন্নতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুন্নতের অনুসরণ পারিবারিক জীবনে শান্তি, সৌভাগ্য, এবং পারস্পরিক সম্পর্ককে মজবুত করে। সুন্নতের অনুসরণ করে, পরিবার সদস্যরা একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল, এবং দয়ালু হতে পারে। সুন্নতের অনুসরণ করে, পরিবার সদস্যরা একে অপরের সাথে ভাল আচরণ করতে এবং সম্মান করতে শেখে।

সুন্নতের অনুসরণ পারিবারিক জীবনে নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে:

- **শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা:**
  সুন্নতের অনুসরণ, যেমন - নিয়মিত নামাজ পড়া, কুরআন তেলাওয়াত করা, এবং হালাল খাবার গ্রহণ করা, শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।
- **পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন:**
  সুন্নতের মাধ্যমে পরিবার সদস্যরা একে অপরের প্রতি সহানুভূতি, ভালোবাসা এবং সম্মান দেখিয়ে নিজেদের সম্পর্ককে মজবুত করে তোলে।
- **সন্তানদের সঠিক লালন-পালন:**
  সুন্নতের শিক্ষা অনুযায়ী, বাবা-মা তাদের সন্তানদের সঠিক শিক্ষা ও নৈতিকতা দিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য তৈরি করে।
- **সামাজিক বন্ধন:**
  সুন্নতের মাধ্যমে পরিবার সদস্যরা সমাজের অন্যান্য মানুষের সাথেও ভালো সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে।
- **পারিবারিক জীবনে শান্তি:**

সুন্নতের অনুসরণ পারিবারিক জীবনে শান্তি ও স্থিতিশীলতা আনতে সহায়ক। সুতরাং, পারিবারিক জীবনে সুন্নতের অনুসরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি পরিবারকে সুখী ও সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করে।সবচেয়ে পরিপূর্ণ মুমিন হলো সেই ব্যক্তি যিনি উত্তম চরিত্রবান এবং পরিবারের প্রতি দয়ালু। পরিবারকে হালাল উপায়ে আনন্দ দেওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত।

সামাজিক জীবনে সুন্নতের ভূমিকা :

মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে সামাজিকতা ও পারস্পরিক আচরণ কেমন হবে তার যথাযথ পদ্ধতি রাসূল সা. দেখিয়ে গেছেন।সুন্নাত হলো নবী (সাঃ) এর জীবন, কর্ম, কথা এবং তাঁর অনুমোদন বা অস্বীকৃতির মাধ্যমে প্রকাশিত শিক্ষা ও আদর্শ। এটি কুরআন এবং হাদিসের মাধ্যমে সংরক্ষিত, যা মুসলিম সমাজে জীবন পরিচালনার একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে কাজ করে।

ইসলামী আইন ও বিশ্বাসের ভিত্তি:

সুন্নাত কুরআনসহ ইসলামি আইন ও বিশ্বাসের মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

- **জীবন পরিচালনার দিক-নির্দেশনা:**
  সুন্নাত ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দিক-নির্দেশনা প্রদান করে, যা মানুষকে সঠিক পথে চলতে সাহায্য করে।
- **সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ:**
  সুন্নাত মুসলিম সমাজে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ তৈরি ও সংরক্ষণে সাহায্য করে।
- **পরস্পর সাহায্য ও সহযোগিতা:**
  সুন্নাত মানুষকে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা করতে উৎসাহিত করে।
- **শান্তি ও স্থিতিশীলতা:**
  সুন্নাত সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বিশেষভাবে:

- **হাদিস:**
  সুন্নতের অংশ হিসেবে হাদিস, যা নবী (সাঃ) এর বাণী, কর্ম ও অনুমোদন সম্পর্কিত, মানুষকে সঠিক পথে চলতে সাহায্য করে।
- **সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য:**
  সুন্নাত মুসলিম সমাজের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে সাহায্য করে।
- **সামাজিক সম্পর্ক:**
  সুন্নাত সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন ও বজায় রাখতে সাহায্য করে।
- **ধর্মীয় জ্ঞান:**
  সুন্নাত মানুষকে ধর্মীয় জ্ঞান লাভ করতে উৎসাহিত করে।
- **নারী সমাজের ভূমিকা:**

- সুন্নাত নারী সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অবদানকে স্বীকৃতি দেয় এবং তাদেরকে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা হয়।
-

নৈতিকতা ও চরিত্র গঠনের সুন্নত :

নৈতিকতা হলো ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত এর পার্থক্য নির্ণয়কারী মানদণ্ড। চরিত্র হলো একজন ব্যক্তির স্থির নৈতিক গুণাবলী। ইসলামে, সুন্দর চরিত্র গঠনের জন্য কুরআন ও সুন্নতের অনুসরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ.

সুন্নতের মাধ্যমে নৈতিক চরিত্র গঠনের কিছু দিক নিচে আলোচনা করা হলো:

- **নবীজির আদর্শ অনুসরণ:**
  নবীজির (সা:) জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ অনুসরণ করে নৈতিকতা ও চরিত্র গঠন করা যায়। তিনি ছিলেন মানবজাতির জন্য এক আদর্শ.
- **সততা ও বিশ্বাসযোগ্যতা:**
  সততা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নৈতিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। নবীজি (সা:) ছিলেন অত্যন্ত সত্যবাদী ও বিশ্বাসযোগ্য, তাই তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে সততা ও বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করা যায়.
- **বিনয় ও নম্রতা:**
  বিনয় ও নম্রতা নৈতিক চরিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। নবীজি (সা:) ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী ও নম্র, তাই তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে বিনয় ও নম্রতা অর্জন করা যায়.
- **অন্যের প্রতি সহানুভূতি:**
  অন্যের প্রতি সহানুভূতি ও ভালোবাসা নৈতিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। নবীজি (সা:) ছিলেন অত্যন্ত সহানুভূতিশীল, তাই তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া যায়.
- **সৎকর্ম ও তাকওয়া:**
  সৎকর্ম করা ও তাকওয়া অবলম্বন করা নৈতিক চরিত্র গঠনের জন্য অপরিহার্য। কুরআন ও সুন্নতে সৎকর্ম ও তাকওয়ার উপর জোর দেওয়া হয়েছে.
- **ইসলামী মূল্যবোধের অনুসরণ:**
  ইসলামে সুন্দর চরিত্র গঠনের জন্য কিছু মূল্যবোধের উপর জোর দেওয়া হয়েছে, যেমন- ন্যায়, সুবিচার, ক্ষমা, দয়া, সহনশীলতা, ইত্যাদি.

মোটকথা, সুন্নতের মাধ্যমে নৈতিকতা ও চরিত্র গঠনে একটি শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করা যায়। কুরআন ও সুন্নতের আদর্শ অনুসরণ করে সুন্দর চরিত্র গড়ে তোলা সম্ভব.

আধুনিক জীবনে সুন্নত চর্চার চ্যালেঞ্জ :

আধুনিক জীবনে সুন্নত চর্চা একটি উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সময়ের অভাব, আধুনিক জীবনযাত্রার চাপ, এবং ভুল ধারণা। এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করে সুন্নত চর্চা বজায় রাখা মুসলিমদের জন্য জরুরি।
বিশেষ করে:

- **সময়ের অভাব:**
  আধুনিক জীবন খুব দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। মানুষ কর্মব্যস্ত এবং সময়ের অভাবে সুন্নত চর্চার জন্য পর্যাপ্ত সময় পায় না।
- **আধুনিক জীবনযাত্রার চাপ:**
  দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজ ও প্রযুক্তির কারণে মানুষের জীবনযাত্রা আগের চেয়ে অনেক বেশি চাপযুক্ত।
- **ভুল ধারণা:**
  কিছু লোক মনে করে যে সুন্নত চর্চা শুধুমাত্র ধর্মীয় অনুশাসন এবং আধুনিক জীবনে এর প্রয়োজনীয়তা নেই।

এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করে সুন্নত চর্চা বজায় রাখার জন্য:

- **সময় তৈরি করা:**
  সুন্নত চর্চার জন্য সময় বের করতে হবে। কাজের ফাঁকে অথবা রাতের বেলা কিছু সময় বের করে সুন্নত পালন করা যেতে পারে।
- **সুন্নতের প্রতি মনোযোগ দেওয়া:**
  সুন্নতের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে হবে এবং এটিকে জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।
- **ভুল ধারণা দূর করা:**
  সুন্নতের সঠিক ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং ভুল ধারণা দূর করতে হবে।
- **সহযোগিতা করা:**
  পরিবার, বন্ধু এবং সমাজের অন্য মুসলিমদের সহযোগিতা নিয়ে সুন্নত চর্চা বজায় রাখা সম্ভব।

এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করে সুন্নত চর্চা বজায় রাখা মুসলিমদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সুন্নত চর্চা হলো রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর আদর্শ অনুসরণ এবং এটি আমাদের জীবনকে আরও সুন্দর ও শৃঙ্খলাময় করে তুলা।

সুন্নত বাস্তবায়নে করণীয় দিক নির্দেশনা :

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ঈমান আনার অর্থই হল, তাঁর নীতি ও সুন্নাহকে আমরা নিজেদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করছি। আল্লাহ তাআলা এজন্যই রাসূল প্রেরণ করেছেন যে, আল্লাহর আদেশে তাঁর অনুসরণ করা হবে।
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله

(তরজমা) আমি রাসূল এই উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করেছি যে, আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে তার আনুগত্য করা হবে।-সূরা নিসা (৪) : ৬৪

আল্লাহ তাআলার নিকট বান্দা তখনই মুমিন সাব্যস্ত হয় যখন সে রাসূলকে নিজের সকল বিষয়ের সিদ্ধান্তদাতা (হাকাম) বলে স্বীকার করে এবং তাঁর সকল সিদ্ধান্ত মনেপ্রাণে মেনে নেয়। সকল দ্বিধা ও সংশয় ত্যাগ করে তাঁর ফয়সালার সামনে নিজেকে পুরোপুরি সমর্পিত করে।
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.

(তরজমা) কিন্তু না, আপনার প্রতিপালকের শপথ! তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসংবাদের বিচারভার আপনার উপর অর্পণ না করে; অতপর আপনার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তাদের মনে কোনো দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়।-সূরা নিসা (৪) : ৬৫

মুমিনকে আল্লাহ তাআলা একটি ব্যবস্থাই দিয়েছেন, যাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে আল্লাহর নিকট কোনো কিছু আশা করার পূর্বশর্ত। আর তা হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদত্ত ব্যবস্থা ও তাঁর পবিত্র জীবনাদর্শ।
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.

(তরজমা) তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।-সূরা আহযাব (৩৩) : ২১

এই উত্তম আদর্শ দ্বারা ঐ জীবনাদর্শই উদ্দেশ্য, যা সূরায়ে জাসিয়ায় এভাবে বলা হয়েছে-

ثم جلعنك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وان الظلمين بعضهم اولياء لبعض والله ولى المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون.

(তরজমা) এরপর আমি আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি দ্বীনের বিশেষ বিধানের উপর। সুতরাং আপনি তা অনুসরণ করুন। অজ্ঞদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না। আল্লাহর মুকাবিলায় তারা আপনার কোনো উপকার করতে পারবে না। যালিমরা একে অপরের বন্ধু আর আল্লাহ তো মুত্তাকীদের বন্ধু।

এই কুরআন মানবজাতির জন্য সুস্পষ্ট দলিল এবং নিশ্চিত বিশ্বাসী জাতির জন্য পথনির্দেশ ও রহমত।-সূরা জাসিয়াহ (৪৫) : ১৮-২০

কালিমায়ে তাওহীদ ও কালিমায়ে শাহাদতে আমরা এই শরীয়ত ও এই আদর্শকে সত্যতা ও যথার্থতার স্বাক্ষ্য দেই এবং মনেপ্রাণে তা কবুল করার ঘোষণা দান করি। এজন্য আমাদের উপর ফরয, এই আদর্শের আলোকে আমাদের পুরো জীবন, জীবনের প্রতিটি অঙ্গনকে যাচাই করা। অতপর যেখানেই ক্রুটি ও অসম্পূর্ণতা দেখা যায় সংশোধনের চেষ্টা করা।

আজ সময়ের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন এই যে, আমরা প্রত্যেকে এবং সমাজের প্রতিটি শ্রেণী নিজের জীবন ও কর্মকে সেই ়ায়ে হাসানা'র মাপকাঠিতে যাচাই করব ও নিজেকে সংশোধন করব। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র সীরাতের চর্চা সেভাবেই করব যেভাবে সাহাবায়ে কেরাম করতেন।

সীরাতে নববিয়্যাহ সম্পর্কে আমাদের অবস্থা সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা থেকে ভিন্ন থেকে ভিন্নতর হতে চলেছে। বিশেষত নিম্নের বিষয়গুলোতে -

১. সঠিক জ্ঞান

সাহাবায়ে কেরাম সরাসরি আল্লাহর রাসূলের বাণী শুনতেন, তাঁর জীবনযাপন দেখতেন এবং নিজেদের মাঝে আলোচনার মাধ্যমে সীরাতের সঠিক জ্ঞান অর্জন করতেন। আমরা তাঁর সরাসরি সাহচর্য থেকে বঞ্চিত হলেও আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্যও সীরাতের সঠিক জ্ঞান লাভের পথ খোলা রেখেছেন। কুরআন মজীদ হচ্ছে নবী-জীবনকে জানার সবচেয়ে বড় উৎস। হাদীস ও সীরাতের নির্ভরযোগ্য কিতাব আমাদের

সামনে আছে। সুন্নতের অনুসারী আল্লাহওয়ালা মাশায়েখ বিদ্যমান আছেন। আমরা যদি গভীর মনোযোগ ও চিন্তা-ভাবনার সাথে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করি (কোনো সংক্ষিপ্ত ও নির্ভরযোগ্য তাফসীরের কিতাবের সহযোগিতা নিয়ে), আহলে ইলমদের সাথে পরামর্শ করে হাদীস ও সীরাতের নির্ভরযোগ্য কিতাবপত্র অধ্যয়ন করি এবং সুন্নতের অনুসারী মাশায়েখের সাহচর্যে বসি তাহলে ইনশাআল্লাহ আমরাও সীরাতের সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে পারব।

২. ঈমান ও নির্ভরতা

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র সীরাত ও তাঁর উসওয়ায়ে হাসানার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভরতা ছিল সাহাবায়ে কেরামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। তাঁরা তো এই কল্পনাও করতে পারতেন না যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ঈমান আনার পর তাঁর সুন্নাহ ও আদর্শের কোনো একটি ক্ষুদ্র বিষয়েও সামান্য সংশয়-সন্দেহ হতে পারে! তদ্রূপ এ বিষয়টিও তাদের সমাজে সম্ভব ছিল না যে, বিশ্বাস হবে রিসালতের প্রতি আর শিক্ষা ও সংস্কৃতি এবং সভ্যতা ও জীবনযাপন পদ্ধতি হবে অন্য জাতির!

আজ আমাদের বড় দুর্ভাগ্য এই যে, আমাদের জীবন সংশয় ও স্ববিরোধিতায় পূর্ণ। আমাদের ঈমান মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর অথচ আমাদের জীবনাদর্শ হচ্ছে পশ্চিমা সভ্যতা। সুন্নতে নববীর পরিবর্তে পশ্চিমা সংস্কৃতি আমাদের কাছে অনুকরণীয়। বেশভূষায় আমরা আল্লাহর রাসূলের অনুসারী নই, পশ্চিমাদের অনুসারী।

মসজিদের কিবলা ও মুসল্লিদের চেহারা যদিও বাইতুল্লাহ অভিমুখী, যা হেদায়েত, বরকত ও শান্তি-নিরাপত্তার কেন্দ্র, কিন্তু জীবনের ‘কিবলা’ হোয়াইট হাউস, যা ভ্রষ্টতা ও বিপথগামিতা এবং জুলুম ও ফাসাদের সর্বনিকৃষ্ট কেন্দ্র।

সংবিধানের সূচনা বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম দ্বারা, অথচ ভিতরের অনেক বিধান বিতাড়িত শয়তানের! ...

এ ধরনের অসংখ্য সংঘাত ও স্ববিরোধিতা এবং সংশয় ও কপটতায় জর্জরিত আমাদের মুসলিমসমাজ। এ থেকে মুক্তির একমাত্র পথ সুদৃঢ় ঈমান। আমরা যদি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সত্যবাদিতা, তাঁর সুন্নাহর যথার্থতা এবং শুধু ও শুধু তাঁরই জীবনযাপন পদ্ধতি ‘উসওয়াহে হাসানাহ’ হিসেবে এবং মানবতার শুদ্ধি ও সফলতার একমাত্র উপায় হিসেবে অন্তরের অন্তস্তল থেকে গ্রহণ করতে পারি এবং পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভরতার সাথে এর উপর অটল অবিচল থাকতে পারি, আর মন-মুখ ও চাল-চলনে একথা প্রমাণ করতে পারি যে-

رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحد صلى الله عليه وسلم نبيا.

(আমি আল্লাহকে রব হিসেবে পেয়ে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পেয়ে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট) তাহলেই আমরা মুক্তি পাব।

৩. শ্রদ্ধা ও ভালবাসা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি এবং তাঁর সুন্নাহ ও আদর্শের প্রতি সাহাবায়ে কেরামের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা একটি সর্বজনবিদিত বিষয়। তাঁদের গোটা জীবনই ছিল এর বাস্তব প্রমাণ। পক্ষান্তরে এ বিষয়ে আমাদের দূরত্ব অত্যন্ত মর্মান্তিক। আমাদের সাধারণ অবস্থা এই যে, মুখে ভালবাসার দাবি অথচ জীবনের সকল কাজ এর বিপরীত। আর অসংখ্য মানুষের মধ্যে আরো যা আছে তা হল মুহাববতের নামে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রধান দুই শিক্ষা তাওহীদ ও সুন্নাহ বিরোধিতা এবং বিদআতে লিপ্ত হওয়া।

৪. নিজ জীবনে প্রয়োগ

সীরাত চর্চার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম ও আমাদের মাঝে সবচেয়ে বড় পার্থক্য এই যে, তাঁরা সুন্নতে নববিয়্যাহ ও উসওয়ায়ে হাসানার প্রতিটি অংশকেই নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করেছেন। অথচ আমরা শাখাগত বিষয়গুলো তো পরের কথা, মৌলিক বিষয়গুলো থেকেও উদাসীন।

৫ শুধু একটিমাত্র মাপকাঠি:

মোটকথা, সাহাবায়ে কেরামের কাছে হক-বাতিল, কল্যাণ-অকল্যাণ, আলো-অন্ধকার, সুপথ-বিপথ ও সফলতা-ব্যর্থতার একটিমাত্র মাপকাঠিই ছিল। আর তা হল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, তাঁর প্রতি অবতীর্ণ সর্বশেষ গ্রন্থ কুরআনুল কারীম, তাঁকে প্রদত্ত সর্বশেষ জীবনপদ্ধতি-শরীয়তে মুহাম্মাদিয়া, তাঁর পবিত্র সীরাত ও সুন্নাহ তথা উসওয়ায়ে হাসানাহ।

৬. সুন্নাহর ভিন্নতা কিংবা ইজতিহাদের ভিন্নতায় অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা

সীরাত ও সুন্নাহর বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ এটাও ছিল যে, তাঁরা সুন্নাহর ভিন্নতা ও ইজতিহাদের ভিন্নতার ক্ষেত্রে পরস্পর আলোচনা-পর্যালোচনা তো করতেন। কিন্তু পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ, তর্কবিতর্কে লিপ্ত হতেন না; বরং প্রত্যেকে অন্যের আমলকে, অন্যের মতকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহ. (মৃত্যু : ৭২৮ হি.) তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে সাহাবায়ে কেরামের সীরাতের এই বিষয়টি সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন। আর সুন্নাহর বিভিন্নতা বা বৈধ মতপার্থক্য শিরোনামে তিনি নিজে এবং তাঁর শাগরিদ ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম

রাহ. (মৃত্যু : ৭৫১হি.) অনেক বিষয় উল্লেখ করেছেন। যেমন-আযানে তারজী’ তথা শাহাদাতের বাক্যদুটির পুনরাবৃত্তি হবে কি হবে না, ইকামতের বাক্যগুলো দুই দুই বার করে পড়া হবে কি একবার করে, সিররী কিরাআতের (নিম্নস্বরে কুরআন তিলাওয়াতের) নামাযগুলোতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া হবে কি হবে না, আমীন উচ্চস্বরে বলা হবে নাকি নিম্নস্বরে, রুকু ইত্যাদির তাকবীরে হাত তোলা হবে কি হবে না ইত্যাদি। এছাড়াও এজাতীয় অনেক মাসআলা তাঁরা একত্র করেছেন, যাতে সাহাবা-যুগ থেকেই মতভিন্নতা চলে এসেছে এবং উভয় দিকেই সাহাবায়ে কেরামের আমলও রয়েছে। উভয় পক্ষেরই দলিল-প্রমাণ রয়েছে। তবে কোন পদ্ধতিটি উত্তম বা অগ্রগণ্য শুধু এটুকু নিরূপণের ক্ষেত্রে ইমামগণের মাঝে মতপার্থক্য হয়েছে।

শায়খ ইবনে তাইমিয়া রাহ. লেখেন, যখন এই সবগুলো পদ্ধতিই বৈধ এবং প্রত্যেক পদ্ধতিতেই ইবাদত হয়ে যায় তখন উত্তম ও অগ্রগণ্য নিরূপণে যে মতপার্থক্য তা তো মারাত্মক কিছু নয়; বরং কখনো তো এমনও হয় যে, দলিল-প্রমাণের আলোকে উভয় পদ্ধতিই সমান। আর একটি পদ্ধতি উত্তম হলেও এর বিপরীত পদ্ধতিতে আমলকারীর প্রতি জুলুম করা জায়েয নয়। তার সম্পর্কে কটু কথা বলা ও তার দোষ অন্বেষণ করা জায়েয নয়।

তিনি আরো বলেন, এ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর ইজমা রয়েছে। এমনকি মুজতাহিদ থেকে যদি কোনো ভুলও হয়ে যায় তবুও উম্মাহর সর্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, তার নিন্দা করা জায়েয নয়।-রিসালাতুল উলফাহ বাইনাল মুসলিমীন পৃ. ৪৬ আরো দেখুন : আলফাতাওয়াল কুবরা ১/১৪০; ইকতিযাউস সীরাতিল মুসতাকীম ১/১২৪; মাজমুউল ফাতাওয়া ২৪/২৪২-২৫২, ১৯/১১৬-১২৮, ৩/২৮২-২৮৮, ৩১০-৩১৪, ৪১৫-৪২২, ২৪/১৭০-১৭৬; যাদুল মাআদ, ইবনুল কায়্যিম

সুন্নাহর বিভিন্নতা কিংবা ইজতিহাদের মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে একে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা, পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদ থেকে বিরত থাকা, একে অন্যকে রাসূলবিরোধী, সুন্নাহবিরোধী বা হাদীসবিরোধী প্রভৃতি উপাধিতে আখ্যায়িত না করা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরই শিক্ষা ও সন্নাহর অনুসরণের শামিল। রিসালাতুল উলফা, আদাবুল ইখতিলাফ ফী মাসাইলিল ইলমি ওয়াদ দ্বীন ও ড. আবদুল্লাহ যইফুল্লাহ রুহায়লীর ‘দাওয়াতুন ইলাস সুন্নাহ ফী তাতবীকিস সুন্নাহ মানহাজান ওয়া উসলুবান’ ইত্যাদি কিতাব থেকে এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষা ও নির্দেশনা সম্পর্কিত হাদীস ও আছার অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

এসব মাসাইলে যে মতপার্থক্য তা কখনো নিন্দনীয় নয়, কিন্তু এই মতপার্থক্যকে বিবাদ-বিসংবাদের বুনিয়াদ বানানো চরম নিন্দনীয়। আর দুই পক্ষের যে কেউ অন্যের

প্রতি কটুক্তি করলে তা হবে সুন্নাহ ও ইজমার বিরোধিতা। চাই এটা তারা আমল বিলহাদীসের নামেই করুক বা ধর্মীয় গায়রতের নামে করুক। আর সুন্নাহর বিভিন্নতার ক্ষেত্রে অপর সুন্নাহর উপর আমলকারীকে মন্দ বলা সরাসরি সুন্নাহর উপর আক্রমণের নামান্তর। আমাদেরকে সুন্নাহ অনুসরণের আদেশ করা হয়েছে। কিন্তু একটি সুন্নাহকে গ্রহণ করে অন্য সুন্নাহকে রহিত করা কিংবা তার অনুসারীদের নিন্দা করার অনুমতি কখনো দেওয়া হয়নি।

বর্তমানে এই বিপদটিই বড় হতে চলেছে। আমল বিল হাদীসের নামে সুন্নাহর বিরোধিতা, ইত্তেবায়ে সুন্নতের নামে উম্মতের ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করা আর তাকলীদের বিষয়ে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার দরুণ কাউকে সামগ্রিকভাবে বিতর্কিত করা ও তার সকল ভালো দিকগুলো অস্বীকার করা হয়। অথচ সঠিক পথে অবিচল থাকা যেমন সুন্নাহ তেমনি সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত ব্যক্তির প্রতি আপত্তি করার ক্ষেত্রে সঠিক পন্থা অবলম্বন করা।দ্বীন ও দুনিয়ার বিষয়ে মানুষ এমন হাজারো অবস্থার সম্মুখীন হয় যখন একসঙ্গে অনেকগুলো হক ও দায়িত্ব তার কাঁধে এসে পড়ে। বাহ্যত মনে হয় এসব হক ও দায়িত্ব একসাথেই আঞ্জাম দেওয়া উচিত। অথচ তার পক্ষে কার্যত তা সম্ভব নয়। এমন পরিস্থিতিতে সম্ভাব্য পদ্ধতি অন্বেষণ কিংবা অগ্রাধিকারের নীতি অবলম্বন করা ছাড়া উপায় থাকে না। এ রকম পরিস্থিতিতে এটাই সুন্নাহ। আর তা এমন সুন্নাহ যে, তার সঠিক প্রয়োগের জন্য অনেক বেশি ধর্মীয় প্রজ্ঞার প্রয়োজন। কারো মধ্যে দ্বীনের ‘ফিকহে আম’ (সাধারণ বোধ) তৈরি না হলে এ সুন্নাহর উপর আমল করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সে বাড়াবাড়ি ছাড়াছাড়ির শিকার হবে।

এসব বিষয়ে সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত সচেতন ও সতর্ক ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁদের স্বভাবেই ফিকহ দান করেছিলেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহচর্যের বরকতে তাঁদের মধ্যে দ্বীনের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা জাগ্রত হয়েছিল। অবশ্য এ ক্ষেত্রে তাদের মাঝে স্তর ভিন্নতাও ছিল। এজন্য অন্যান্য দ্বীনী বিষয়ের মতো এ বিষয়েও তারা প্রয়োজনের সময় পরস্পর মতবিনিময় করে নিতেন। ছোটজন বড়জন থেকে জেনে নিতেন।

আজ আমাদের সমাজ যেসব কঠিন বিপর্যয়ের সম্মুখীন তার মধ্যে একটি মারাত্মক বিষয় হল সমন্বয় ও অগ্রাধিকারের বিষয়ে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুতি, ‘তাকদীমুল আহাম ফালআহাম’ নীতি সম্পর্কে অজ্ঞতা ও তার সঠিক প্রয়োগের বিষয়ে ব্যর্থতা ও উদাসীনতা। এটি সমাজের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফরযের চেয়ে নফলের প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ, কবীরা গুনাহয় লিপ্ত থেকে সগীরা গুনাহর বিষয়ে শোরগোল,

জীবনের বহিরঙ্গ পরিপাটি অথচ অন্দরের পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে উদাসীন, মুস্তাহাব বিষয়ে যত্নবান অথচ মানুষের অধিকার হরণ, ইবাদত-বন্দেগীতে স্পৃহা অথচ হালাল জীবিকার বিষয়ে অনীহা, সুনানে আদিয়া তথা অভ্যাসগত সুন্নতের প্রতি তাকিদ অথচ অসংখ্য সুনানে হুদা ও প্রকৃত সুন্নাহর ব্যাপারে অকল্পনীয় উদাসীনতা, নিজের ও নিজের সন্তানের সংশোধন সম্পর্কে উদাসীন অথচ জাতি ও রাষ্ট্র নিয়ে চিন্তা এবং এ জাতীয় আরো অসংখ্য উপসর্গ। আর এসবের ফলাফল এই যে, আমরা ফিকহুল আওলাওয়িয়াত তথা আলআহাম ফালআহাম-নীতির সঠিক জ্ঞান ও তার সমন্বয় প্রদানের ক্ষেত্রে উদাসীনতার পরিচয় দিয়ে থাকি। অথচ সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন।

উপসংহার :

নবী (সা.)-এর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো ধৈর্য, সহানুভূতি, ন্যায়বিচার এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস। তিনি তাঁর জীবনে আদর্শ জীবনযাপন করে শিখিয়েছেন কিভাবে মানবিক গুণাবলী এবং নৈতিকতার প্রতি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকতে হয়। তাঁর দয়া, উদারতা, পরমত সহিষ্ণুতা, এবং অন্যদের প্রতি সহানুভূতি আমাদের জন্য এক মহান দৃষ্টান্ত। তাছাড়া, নবী (সা.)-এর জীবন আমাদেরকে দেখিয়েছে যে, কঠিন সময়েও আল্লাহর উপর পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা রাখতে হয়।এছাড়া, তাঁর শিক্ষা অনুযায়ী মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করা, মিথ্যা এবং অন্যায় থেকে দূরে থাকা, এবং সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।